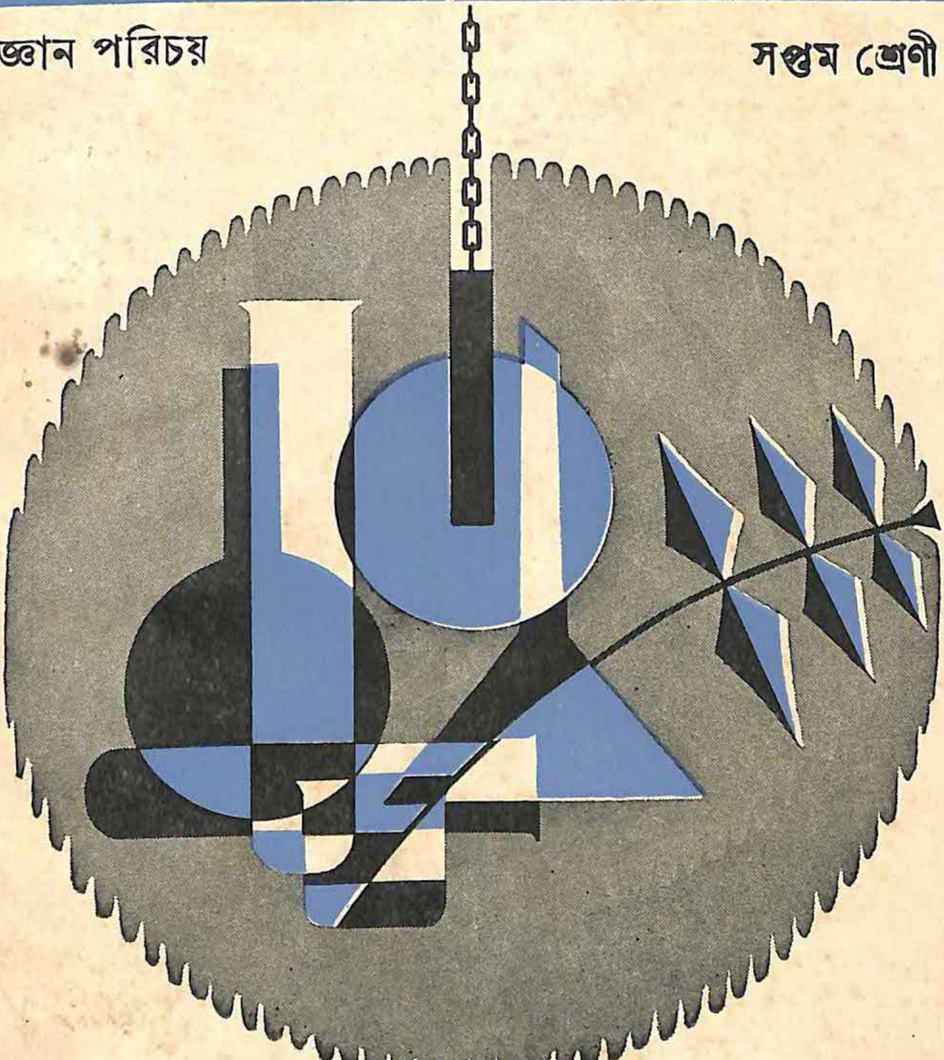
পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন

শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়   অশোক সিংহ   এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

১

বিজ্ঞান পরিচয়

সপ্তম শ্রেণী



PADARTHAVIDYA O RASAYAN 1 (Bengali)

(Physics and Chemistry)

Santimay Chattopadhyay, Asok Sinha, and
Enakshi Chattopadhyay

First published 1974
Second edition (revised) 1977

প্রচ্ছদ : রামকৃষ্ণ দত্ত

ছবি : রঞ্জন কুণ্ডু। বিজ্ঞানী-প্রতিকৃতি : অভিজিৎ গুপ্ত।

Printed in India by R. K. Dutta, at Nabosakti Press, 23, Acharya J. C. Bose Road, Calcutta-700014 and published by R Dayal, Oxford University Press, Faraday House, P-17 Mission Row Extension, Calcutta 700013.

ভূমিকা

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নতুন পাঠক্রমে বিজ্ঞান সর্ব শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের পাঠ্য-তালিকা ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে বিষয়, শিক্ষণ-পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গীতে একটা পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এখন যারা স্কুলে বিজ্ঞান পড়বে তারা প্রত্যেকেই উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে বা পরবর্তী জীবনে বৃত্তি হিসেবে বিজ্ঞানের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে না। এটা অনুমান করে স্কুলে অধীত ধারণাগুলি যাতে তাদের অন্যান্য জ্ঞানের পরিপূরক হয় এই ভাবে পাঠক্রমটির পরিকল্পনা করা হয়েছে। বিজ্ঞানে ভারতের অতীত ঐতিহ্য এবং ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি স্কুলপাঠ্য বিজ্ঞান বইয়ে অবশ্যই অভিনব সংযোজন। তাছাড়া জল, বাতাস, জড় বস্তু, মহাকর্ষ, জ্যোতিষ, আকাশ ও আলোক সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণাগুলির অবতারণাও এই বইয়ে করা হয়েছে যা তাদের পরবর্তী পর্যায়ের জন্য প্রস্তুত করবে। পাঠক্রমের বিভাগ ও বিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ছাত্রদের সহজবোধ্য ভাষায় আমরা এই বইটি লেখার চেষ্টা করেছি। পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে চার বছরের যে পাঠক্রম আছে এটি তার প্রথম পর্যায়। আমরা যে কটি দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছি তা হল : এক, বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলির আধুনিকতম রূপ উপস্থাপন করা ; দুই, যারা পরে বিজ্ঞানে বিশেষ পাঠ নেবে তাদের কৌতূহল জাগ্রত রাখা ; তিন, প্রয়োগের ক্ষেত্র অবহেলা না করা ; এবং চার, ভারতীয় পটভূমির সঙ্গে যতদূর সম্ভব সম্পর্ক নির্ণয় করা। তবে পাঠ্য পুস্তকের চেয়েও শিক্ষকের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা যদি কোথাও পরিবর্তন প্রয়োজন মনে করেন অনুগ্রহ করে জানালে আমরা খুবই উপকৃত হব।

কলকাতা
২রা ডিসেম্বর ১৯৭৪

শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়
অশোক সিংহ
এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

১।	বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী	১
২।	বাতাস	৩০
৩।	জল	৫১
৪।	জড় বস্তু	৬৩
৫।	মহাকর্ষ	৮০
৬।	জ্যোতিষ্ক, আকাশ ও আলো	৯৪

১ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী

বিজ্ঞান কাকে বলে?

বিজ্ঞান পড়া আরম্ভ করার আগে প্রথমেই বুঝে দেখা যাক আমরা যে বিষয়টা পড়তে যাচ্ছি সেটা কি? বিজ্ঞান কাকে বলে? বিজ্ঞান কি

রাজা মহারাজাদের কথা?
গল্প ও কবিতা?
গাছপালা, পশুপাখির কথা?
দেশ বিদেশের কথা?
নক্ষত্রজগতের কথা?

একটু পরে তোমরা নিজে থেকেই বুঝতে পারবে ঐ বিষয়গুলোর মধ্যে কোনটাকে বিজ্ঞান বলা যাবে আর কোনটাকে বলা যাবে না।

বিজ্ঞান ও জ্ঞান এই দুটি শব্দের অর্থ প্রায় একই। আদিম কাল থেকে মানুষ প্রকৃতি সম্বন্ধে কৌতূহল বোধ করেছে, আশ্চর্য হয়েছে, নানারকম প্রাকৃতিক ঘটনার মানে বুঝতে চেয়েছে। পাথরে পাথরে ঘষে ক্রমে তারা আগুন জ্বালতে শিখল। অনেকে মনে করেন আগুনের আবিষ্কারই বিজ্ঞানের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার।

বিজ্ঞানের পদ্ধতি কি?

কোন একটা ঘটনা ঘটতে দেখলে তার কারণ খোঁজা হল বিজ্ঞানের কাজ। এর জন্যে চাই পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও বার বার পরীক্ষা করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছন। তারপর সেই সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে নতুন ঘটনার পূর্বাভাস দেওয়া ও তারপরে সেই ঘটনা

পরীক্ষা করে সিদ্ধান্তের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া। এই কাজে বিজ্ঞানী কিভাবে অগ্রসর হবেন? প্রথমত অন্যের মুখে শোনা কথা তিনি নির্বিবাদে মেনে নেবেন না। অনেক দিন আগে, খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীক পণ্ডিত অ্যারিস্টটল লিখে গিয়েছিলেন যে, যদি কোন উঁচু জায়গা থেকে একটি ভারি ও একটি হালকা বস্তু একসঙ্গে ফেলা হয় তবে ভারি বস্তুটি আগে মাটিতে পৌঁছবে। প্রায় দুহাজার বছর লোকে এই কথা বিশ্বাস করত। ষোড়শ শতাব্দীতে ইতালির বিজ্ঞানী গ্যালিলিও প্রমাণ করলেন উক্তিটি ঠিক নয়। পিসার হেলান মিনার থেকে একটা একশো পাউণ্ড আর একটা এক পাউণ্ডের পাথরের টুকরো মাটিতে ফেলে সকলের সামনে তিনি প্রমাণ করে দেখালেন যে ভারি বা হালকা যাই হোক সব বস্তু একই সময়ে মাটিতে এসে পৌঁছয়। একটা কাগজের টুকরো আর একটা পাথর ফেললে অবশ্য কাগজটা ভাসতে ভাসতে পরে পড়বে, কিন্তু সে হাওয়ার বাধার জন্য। হাওয়া না থাকলে কাগজ আর নুড়ি একই সময়ে পড়ত।

চারপাশে যা আছে তা ভালো করে লক্ষ্য করা এবং কোনটা কি করে ঘটছে বুঝতে চেষ্টা করা আসল বিজ্ঞানীর লক্ষণ। ইংরেজ বিজ্ঞানী নিউটন 1665 সালে লণ্ডনে প্লেগ হচ্ছে বলে গ্রামে চলে যান। সেখানে প্রচুর গাছপালা। একদিন গাছ থেকে আপেল পড়তে দেখে তাঁর মনে একটা খটকা লাগে। আপেলটা সোজা নিচের দিকে পড়ল কেন? এর মধ্যে কি কোন বিশেষ কারণ আছে যাতে সব আপেলই সব সময় নিচের দিকে পড়বে? যদি পাশ থেকে খুব জোরে হাওয়া বইত তাহলে ফলটা ঠিক তলায় না পড়ে একটু দূরে গিয়ে পড়ত। কিন্তু পড়ত ঠিকই। হাওয়ার ধাক্কায় মাটির সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে উড়তে থাকত না। আপেল ও পৃথিবীর সম্পর্ক থেকে আরম্ভ করে পৃথিবী ও চাঁদের কথাও ভাবতে শুরু করলেন তিনি। আবিষ্কার হল মহাকর্ষ তত্ত্ব—যে কোন দুটি বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা

জেমস্ ওয়াট নামে একটি ছোট ছেলে একদিন রান্নাঘরে বসে উনুনে রাখা কেতলির দিকে তাকিয়ে ছিল। জল যেই ফুটতে আরম্ভ করল কেতলির ঢাকাটি ওঠানামা শুরু করল। জেমস তো আশ্চর্য, সে বার বার দেখে বুঝল ভিতর থেকে স্টীম ধাক্কা দেওয়ার ফলেই এই ব্যাপার ঘটছে। ব্যাপারটা ভাল করে বোঝবার জন্য ছেলেটি বারবার কেতলির ঢাকাটা খুলে, কখনো কেতলির মুখে কাপ চাপা দেয়, কখনো প্লেট চাপা দেয়। শেষে তার মা বিরক্ত হয়ে তাকে পড়তে বসতে বলেন। বড় হয়ে এই পর্যবেক্ষণের ফল প্রয়োগ করে তিনি স্টীম এঞ্জিন তৈরি করলেন। এখন আমরা স্টীম এঞ্জিনকে অতি সাধারণ জিনিস বলে মনে করি। কিন্তু একদিন তোমাদের মত একটি ছেলে অত্যন্ত পরিচিত একটি ঘটনা লক্ষ করে এই শক্তির সন্ধান পেয়েছিল বলেই আজ আমরা ট্রেনে করে ঘণ্টায় 150 কিলোমিটার চলে যাচ্ছি।

কিন্তু উদ্দেশ্যহীন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বৈজ্ঞানিক সত্যের আবিষ্কার সম্ভব নয়। সমস্যাকে আলাদা করে নিতে হবে। বহু-মুখী প্রতিভা সত্ত্বেও একাগ্রতার অভাবে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে বেশি দিন অনুসরণ করার মত ধৈর্যের অভাবে লিওনার্দো দা ভিঞ্চি তাঁর কোন গবেষণাই শেষ করে যেতে পারেন নি। পঞ্চদশ শতাব্দীর মানুষ লিওনার্দো প্রধানত চিত্রশিল্পী বলেই বিখ্যাত। কিন্তু তিনি অনেক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা আর গবেষণা করেছিলেন, কিন্তু যেখানে সেখানে তার বিবরণ লিখে রাখায় সেগুলো পরবর্তী কালের মানুষের কাছে পৌঁছয় নি। পরিশ্রম আর একাগ্রতার অভাবে অনেক মূল্যবান আবিষ্কারের সূচনা করেও তিনি শেষ করতে পারেন নি।

বিজ্ঞানের নানা বিভাগ

বিজ্ঞানের ক্ষেত্র বিস্তৃত। কোন একজনের পক্ষে বিজ্ঞানের সমস্ত

বিষয়গুলি আয়ত্ত করা দুরূহ। সেইজন্য বিজ্ঞানকে নানা শাখায় ভাগ করা হয়েছে। মোটামুটি ভাবে দুটি প্রধান শাখা—প্রাণবিজ্ঞান ও ভৌত বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের যে সব শাখায় জীবন্ত বস্তুর আলোচনা করা হয় তাকে বলে প্রাণবিজ্ঞান। তোমরা অন্য বইয়ে প্রাণবিজ্ঞানের কিছু কিছু বিষয় পড়বে। জড় বস্তুর ধর্ম ও প্রকৃতি নিয়ে ভৌত বিজ্ঞান। ভৌত বিজ্ঞানকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়—পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও গণিত। গণিত তোমরা আলাদা করে পড়ছ। এই বইয়ে পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন নিয়ে আলোচনা থাকবে। বিজ্ঞানের পাঠ যত এগোবে, দেখবে বিজ্ঞানের প্রতিটি বিভাগ আরো অনেক শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত। যেমন আণবিক জীববিদ্যা, কেলাস বিদ্যা, জীবাণু বিদ্যা, পেট্রলজি, প্রাণ রসায়ন, জৈব রসায়ন, প্রাণ পদার্থবিদ্যা, পরিসংখ্যান, মহাকাশ বিদ্যা, পরমাণুবিজ্ঞান ইত্যাদি।

বিজ্ঞান ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগ

বহুদিন পর্যন্ত বিজ্ঞান ছিল পণ্ডিতদের আলোচনার বস্তু, সাধারণ লোকের জীবনের সঙ্গে তার বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। আমাদের বেদ ও উপনিষদে নানারকম চমকপ্রদ বৈজ্ঞানিক ধারণার উল্লেখ আছে, এমনকি পরমাণু নিয়ে কণাদের উক্তি, কিংবা পরমাণুর বন্ধনী শক্তি নিয়ে জৈন দার্শনিকদের সিদ্ধান্ত পড়লে খুবই আধুনিক বলে মনে হয়। কিন্তু পরমাণু শক্তিকে যে মানুষের উপকারে লাগানো সম্ভব এই জাতীয় চিন্তা তাঁরা মোটেই করেননি। এখন পরমাণু থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে বিভিন্ন কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছে। আমাদের দেশে বোম্বাইএর কাছে তারাপুরে ও রাজস্থানের রাণাপ্রতাপ সাগরে পরমাণুবিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হয়েছে। মাদ্রাজের কাছে কলপক্কমে ও উত্তরপ্রদেশে নারোবায় আরও দুটি পরমাণুবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র তৈরি হচ্ছে। বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ বলতে কি বোঝায় এটা তার এক উদাহরণ। এরকম অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে।

বিজ্ঞানীর কাজ প্রাকৃতিক ঘটনাগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য ও নিয়ম খুঁজে বার করা। কারিগর বা এঞ্জিনিয়ারের কাজ সেই সব নিয়ম প্রয়োগ করে আমাদের ব্যবহারে লাগানো। বিজ্ঞানী নিউটন আবিষ্কার করেন প্রত্যেক ক্রিয়ার বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। এই সূত্র প্রয়োগ করে এখন মহাকাশে রকেট পাঠানো হচ্ছে। আজকাল বিজ্ঞানের কোন নতুন আবিষ্কার হবার সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ আরম্ভ হয়ে যায়। গত দেড়শো বছরে বিজ্ঞান মানুষের জীবনযাত্রায় অনেক বদল ঘটিয়েছে।

আজ থেকে দুহাজার বছরেরও আগে গ্রীসে আর্কিমিডিস নামে এক বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি নানারকম বৈজ্ঞানিক বিষয়ে চিন্তা করতেন ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে রোমান শত্রুদের নাস্তানাবুদ করেছিলেন। তিনি ছিলেন একই সঙ্গে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানী আর কুশলী কারিগর। তাঁর যে সব আশ্চর্য কাণ্ডকারখানায় সবাই চমৎকৃত হত সেগুলি তিনি অবসর কাটাবার জন্য করতেন এবং কেউ বাহবা দিলে খুব বিরক্ত বোধ করতেন। একবার রাজা তাঁকে বলেন তাঁর সোনার মুকুটে ভেজাল দেওয়া আছে কিনা কোন বৈজ্ঞানিক উপায়ে বার করে দিতে। আর্কিমিডিস কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করেন সেটা তোমরা এই বইয়ের শেষের দিকে পড়বে।

বিজ্ঞানের উন্নতি কি ভাবে হয়েছে

আজ আমরা বিজ্ঞানের দৌলতে যে সব সুখ সুবিধে ভোগ করছি তার পিছনে কিন্তু অনেক দিন ধরে অনেকের চিন্তাভাবনা ও পরিশ্রম আছে।

প্রত্যেকটি আবিষ্কারের কথা আলাদা করে বলতে গেলে অনেক জায়গা ও সময় লেগে যাবে। তোমরা নিজেরাই দেশ বিদেশের বিজ্ঞানীদের কথা জানবার চেষ্টা কোরো। সংক্ষেপে বিজ্ঞানের উন্নতির কথা বলতে গেলেও অনেক নাম বাদ পড়ে যাবে, অথচ

কারো কাজই অন্যের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। তাছাড়া মনে রেখো কোন আবিষ্কার কখনো একদিনে হয়নি। অনেক আবিষ্কারকের নাম আমরা মনেও রাখিনি। রেডিও আবিষ্কার করেছেন ইতালির বিজ্ঞানী মার্কনি, এই কথাই সকলে জানে। কিন্তু জগদীশচন্দ্র তার বেশ কয়েক বছর আগেই বেতার তরঙ্গ দিয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় খবর পাঠাতে পেরেছিলেন।

প্রকৃতি থেকে শক্তি

আগেই বলা হয়েছে বিজ্ঞানের কাজ হল প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি কি নিয়মে চালিত হচ্ছে সেটা বার করা। বুদ্ধি খাটিয়ে এই সব নিয়ম মানুষের কাজে প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া গেছে। হাওয়া আর জল শুধু যে আমাদের প্রাণধারণের উপাদান তাই নয়, হাওয়ার বেগ আর জলের স্রোতে লুকিয়ে আছে প্রচণ্ড শক্তি। দৈহিক শক্তি দিয়ে যা কাজ করা চলে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি কাজ পাওয়া যায় প্রাকৃতিক শক্তি প্রয়োগ করে। এটা বুঝতে পেরেই প্রাচীন কালে জলশক্তি আর বায়ুশক্তি ব্যবহার আরম্ভ হয়। রানী ক্লিওপাট্রার আমলে সারি সারি ক্রীতদাসদের দিয়ে দাঁড় টানিয়ে চালানো হত বিরাট বিরাট নৌকো। এমনকি সপ্তদশ শতাব্দীতেও আমেরিকার বহু রাজ্যে নিগ্রো ক্রীতদাসদের দৈহিক শক্তি খাটিয়ে তুলোর চাষ করা হত। ক্রমে যান্ত্রিক শক্তি এসে দৈহিক শক্তির জায়গা নিল। যন্ত্র কোন কোন শক্তিতে চলে? যন্ত্র চলে কয়লা, পেট্রল, জলশক্তি ও পারমাণবিক শক্তি থেকে উৎপন্ন বিদ্যুতে। এই সব শক্তিকে কাজে লাগানো গেছে বিজ্ঞান বুদ্ধির সাহায্যে।

শক্তি যে আমাদের নিত্যকার জীবনে কত দরকারী তা আজকাল বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হলে তোমরা ভাল ভাবেই বুঝতে পার। তখন যে বৈদ্যুতিক আলো, পাখা, ট্রেন, রেডিও সব থেমে যায় তাই নয়, গম পেষার কলও বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ যাতায়াত, খাদ্য, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সব ব্যাপারেই আমরা এখন একান্তভাবে বিদ্যুৎ শক্তির

উপর নির্ভরশীল। শক্তি কোন কোন জ্বালানী থেকে উৎপন্ন হয় তা একটু আগেই বলা হয়েছে। এর মধ্যে কয়লা ও পেট্রোলিয়ম ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে বলে বিজ্ঞানীরা চিন্তায় পড়েছেন। নতুন জ্বালানীর সন্ধান করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য ও খাদ্য

বৈজ্ঞানিক উপায়ে আজকাল বেশি ফসল ফলানো যাচ্ছে, তাছাড়া খাবার শুকিয়ে নিয়ে, ঠাণ্ডায় জমিয়ে অথবা বায়ুশূন্য টিনে প্যাক করে অনেক দিন সংরক্ষণ করা যাচ্ছে। খাদ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণ এই দুটি কাজেই বিজ্ঞান আমাদের প্রভূত উপকারে এসেছে। এছাড়া অসুখবিসুখ করলে আজকাল আর ভাগ্যের উপর নির্ভর করে বসে থাকার কোন কারণ নেই। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এত উন্নতি হয়েছে যে আজকাল প্রায় কোন রোগই আর দুরারোগ্য নেই—এমনকি একজন মানুষের দেহে অন্য একজনের হৃদযন্ত্র পর্যন্ত জোড়া লাগান হচ্ছে। সময়মত টিকে ও ইনজেকশনের গুণে আগেকার মত মড়ক লেগে হাজার হাজার লোক মারা যায় না। আগে আমাদের দেশে শিশুমৃত্যুর হার ছিল খুব বেশি, সেইজন্য ভারতীয়দের গড় আয়ু ছিল সাতাশ। এখন সেটা বেড়ে হয়েছে বাহান্ন। চিকিৎসাবিজ্ঞানে যত আবিষ্কার হয়েছে তার সব নাম করা এখানে সম্ভব নয়। আমরা কেবল দুজনের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করব। তাঁরা হলেন লুই পাস্তুর ও আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং।

লুই পাস্তুর (1822-1895) ছিলেন একজন ফরাসী বিজ্ঞানী। তিনি পড়াতেন পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন। ক্রমে তাঁর গবেষণা থেকে এক নতুন বিজ্ঞানের জন্ম হয়। তার নাম অণুজীববিদ্যা বা মাইক্রোবায়োলজি। দুধ টকে যায় কেন, এই নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করেন চোখে দেখা যায় না এমন সব জীবাণুর অস্তিত্ব। এইগুলি সব সময়েই বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। একটা নির্দিষ্ট তাপে দুধ প্রভৃতি তরল পদার্থ ফোটালে যে জীবাণুগুলো

মরে যায় এটা আবিষ্কার করে তিনি এক নতুন যুগের সূচনা করেন। তাছাড়া বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক টিকেরও আবিষ্কর্তা ইনিই।

আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং (1881-1955) ছিলেন জীবাণুবিদ বা ব্যাকটিরিওলজিস্ট। পেনিসিলিন আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে যুগান্তর ঘটিয়েছে—ইনিই তার আবিষ্কারক।

1928 সালে ফ্লেমিং কতকগুলো জীবাণু নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। দিনটা ছিল স্যাঁৎসেঁতে। যে প্লেটে জীবাণু কালচার করা হচ্ছিল তার ঢাকা খুলে ফ্লেমিং দেখেন তাতে ছাতা পড়েছে, দেখে বিরক্ত হন। অন্য কেউ হলে হয়ত কালচারটা নষ্ট হয়ে গেছে বলে সবশুদ্ধ ফেলেই দিত। কিন্তু ফ্লেমিং খুঁটিয়ে লক্ষ করে দেখেন যেখানে যেখানে ছাতা পড়েছে তার কাছাকাছি জীবাণুগুলো মরে গেছে। এই দেখে কৌতূহলী হয়ে তিনি ঐ ছাতার একটা অংশ আলাদা করে নিয়ে বিভিন্ন জীবাণুর উপর তার প্রভাব পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। দেখা গেল ঐ ছাতা বা ছত্রাক জীবাণুর বৃদ্ধি একেবারে থামিয়ে দিচ্ছে। এর থেকেই পেনিসিলিনের জন্ম।

যাতায়াত ও যোগাযোগ

আশী দিনে পৃথিবী ভ্রমণ করে জুল ভার্নের গল্পের নায়ক একটা বিরাট কাণ্ড করেছিলেন। এখন পৃথিবী পরিক্রমা করতে কতদিন লাগে বলতে পার?

আগেকার দিনে মানুষ পায়ে হেঁটে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেত। যাতায়াতের উন্নতি ও সুবিধার জন্য লোকে ক্রমে জলপথে নৌকো ও স্থলপথে গরু বা অন্য প্রাণী দিয়ে টানা গাড়ির ব্যবহার শিখল। নৌকো থেকে এল পালতোলা নৌকো ও জাহাজ। মেরু অঞ্চলের মানুষ আজও কুকুরে টানা স্লেজ গাড়ি ব্যবহার করে। যাতায়াতের ক্ষেত্রে যুগান্তর আনল স্টীম এঞ্জিন।

জেমস ওয়াটের কথা তোমরা শুনেছ। ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবিতে তাঁর সমাধির উপর লেখা আছে 'তিনি মানুষের শক্তিবৃদ্ধি

করেছিলেন।' কথাটা ভেবে দেখবার মত। কারণ এর আগে চাকা ঘোরাতে বা পাম্প চালাতে হলে লোকে হয় হাত দিয়ে নয় হাওয়া বা জলের তোড়ে চালাত। স্টীম-এর চাপ প্রয়োগ করে ওয়াট যে মানুষের হাতে অপরিমিত ক্ষমতা এনে দিলেন শুধু তাই নয়, শিল্প ও যোগাযোগ ব্যবস্থার চেহারাই বদলে গেল। আগেকার কালের ঘোড়ার গাড়ি বা পালকির বদলে এল স্টীম টানা ট্রেন। অবশ্য ওয়াটের আবিষ্কারের পর অনেকে—তাঁদের মধ্যে জর্জ স্টিভেনসন একজন—স্টীম এঞ্জিনের অনেক উন্নতি ঘটিয়েছেন। স্টীম এঞ্জিনের পর আরও অনেক নতুন শক্তিচালিত এঞ্জিনের আবিষ্কার হয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পেট্রল এঞ্জিন ও ডিজেল এঞ্জিন। ইলেকট্রিক ট্রেন চলে বিদ্যুতের সাহায্যে। বিমান চলে পেট্রল এঞ্জিনে। বর্তমানে জেট এঞ্জিন চালিত বিমানের গতিবেগ অনেক বেশি—ঘণ্টায় প্রায় 2,000 কিলোমিটার। এখন রকেটে চেপে মানুষ মহাশূন্যে যায়। চাঁদের দূরত্ব প্রায় চার লক্ষ কিলোমিটার। রকেটে চেপে সেখানে যেতে সময় লাগে মাত্র আড়াই দিন।

আগেকার দিনে মানুষ খবর পাঠাত ডাকহরকরার সাহায্যে। কাগজের টুকরো পায়রার পায়ে বেঁধেও ওড়ানো হত। মোগল আমলে সংবাদ আদানপ্রদানে পায়রা ব্যবহারের চল ছিল। তারপর দেখা দিল টেলিগ্রাফ, তার পরে টেলিফোন। এখন তোমরা রেডিওতে খবর শোন ও টেলিভিশনে দূরের ছবি দেখ। আজকের দিনে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে নিমেষের মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে খবর ও ছবি পৌঁছে যাচ্ছে।

প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান

আজ থেকে চার পাঁচ হাজার বছর আগে পৃথিবীতে সভ্য দেশ ও জাতির সংখ্যা ছিল হাতে গোনার মধ্যে। ভারতে তখন সিন্ধু-সভ্যতার যুগ। অতদিন আগেও এখানে বিজ্ঞানের কোন কোন

শাখায় বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়োতে পাওয়া মাটির বাসন এমন চমৎকার পালিশ করা যে কাচের বাসন বলে ভুল হয়। এ ছাড়া তামা ও ব্রোঞ্জ গলানো, ছাঁচে ঢালা, পিটিয়ে যন্ত্রপাতি, অস্ত্র ও গয়না ইত্যাাদ গড়তেও তারা বেশ পটু ছিল। স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে নগর পরিকল্পনা, মাটির নিচে নালা, জলনিকাশ ও জল সরবরাহ ব্যবস্থা ইত্যাদি খুবই উন্নত ধরনের ছিল।

বৈদিক যুগের কথা তোমরা ইতিহাসে পড়েছ। এই যুগে অঙ্ক, জ্যামিতি, চিকিৎসাবিজ্ঞানের খুব উন্নতি হয়। যজুর্বেদে 10^{12} পর্যন্ত সংখ্যার উল্লেখ আছে। অর্থাৎ 10এর পিঠে বারটি শূন্য। সেই সময় অন্য কোন সভ্য দেশে এত বড় সংখ্যা প্রকাশ করার পদ্ধতি জানা ছিল না। যজ্ঞের বেদী তৈরি করা থেকে ক্রমে জ্যামিতির ধারণা গড়ে ওঠে। বর্গ, বৃত্ত, আয়তক্ষেত্র ইত্যাদির সঙ্গে তাদের বাহুর সম্পর্ক নির্ণয় করার ব্যাপারে তাঁরা অনেক দূর এগিয়েছিলেন। এখন পিথাগোরাসের উপপাদ্য নামে যেটি প্রসিদ্ধ তার প্রথম উল্লেখ কিন্তু বেদের একটি সূত্রেই পাওয়া যায়।

ব্যাবিলন ও মিশর প্রাচীন যুগে বিজ্ঞানে কীর্তি স্থাপন করেছিল। কিন্তু তারপরে যে কারণেই হোক তারা পিছিয়ে পড়ে। ভারতে কিন্তু তা হয়নি। বৈদিক যুগের শেষে ভারতে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় কিছুদিনের জন্য অবনতি ঘটলেও বৌদ্ধ যুগে আবার নতুন উদ্যমে কাজ আরম্ভ হয়।

মধ্যযুগে ভারতীয় বিজ্ঞান

এই সময় যে সব বিষয় চর্চা হয় তার মধ্যে জ্যোতিষ, গণিত ও আয়ুর্বেদ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন সময়ে নামকরা গাণিতিক ও জ্যোতির্বিদ ছিলেন আর্যভট, ভাস্কর, ব্রহ্মগুপ্ত, মহাবীর, শ্রীপাদ ও শ্রীধর। এঁদের কারো জীবন সম্বন্ধেই নির্ভুল তথ্য পাওয়া যায় নি। যা পাওয়া গেছে তা হল বিভিন্ন সূত্রে এঁদের উল্লেখ।

আর্যভটের জন্ম 476 সালে বলে মনে হয়। তিনি পাটলিপুত্রের

লোক ছিলেন। মাত্র তেইশ বছর বয়সেই তিনি আর্যভটীয় লিখে বিখ্যাত হন। তাঁর পরে কয়েক শতাব্দী ধরে তাঁর লেখা নিয়ে আলোচনা ও টীকা লেখা হয়েছিল। ভারতীয় জ্যোতির্বিদদের মধ্যে তিনিই প্রথম পৃথিবীর আহ্নিক গতির কথা বলেন। নানা গাণিতিক বিষয়, যেমন বর্গমূল, ঘনমূল, সমান্তর শ্রেণী, ত্রৈরাশিক ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা করে খুব ছোট সূত্রের আকারে তাঁর গবেষণার ফলাফল-গুলি তিনি লিখে গেছেন।

আর্যভট, ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্কর বলেছেন ভারি বস্তুর উপর থেকে নিচে পড়ার কারণ বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণ, এই কথাটাই অনেক দিন পরে নিউটন বলেন। এমনকি তাঁরা এও বলেছিলেন যে তরল পদার্থের ঢালু জায়গার উপর দিয়ে নিম্নগামী গতির কারণ দ্রবত্ব।

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে গতি সম্বন্ধে যে মতবাদ আছে তাকে বেশ আধুনিক বলা চলে। তাঁরা পৃথিবীর টানের নাম দিয়েছেন গুরুত্ব। তীর ছোঁড়ার সময় প্রথমে ছিলার চাপে গতির সঞ্চার হয়, গতি থেকে হয় বেগ। ক্রমে বাতাসের বাধা পেয়ে এই বেগ একেবারে শেষ হলে পৃথিবীর গুরুত্বের টানে তীরটি মাটিতে পড়ে যায়। উপর থেকে কোন বস্তু নিচে পড়ার সময় তার গতি কেমন থাকে এই জাতীয় বলবিদ্যার নানা প্রশ্নেরও সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেছেন তাঁরা। পরে আবার এই সব তথ্য গ্যালিলিও নতুন করে আবিষ্কার করেন।

বীজগণিত ও অ্যালজাব্রার উদ্ভবও কিন্তু ভারতে। অজ্ঞাত রাশির সাহায্যে গণনা করা হত বলে পণ্ডিতরা একে অনেক সময় বলতেন অব্যক্ত গণিত।

ব্রহ্মগুপ্ত ছিলেন উজ্জয়িনীর লোক। তাঁর জন্ম 598 খ্রীস্টাব্দে। তিনি গ্রহদের গতি ও অবস্থান নির্ণয় করার গণনা পদ্ধতি বার করেন। ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ও বৃত্তের ভেতরের চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল বার করেন তিনি। ব্রহ্মগুপ্তের একটি অঙ্ক আছে : কোন সংখ্যাকে

6 দিয়ে ভাগ করলে 5, 5 দিয়ে ভাগ করলে 4, 4 দিয়ে ভাগ করলে 3 এবং 3 দিয়ে ভাগ করলে 2 অবশিষ্ট থাকবে ?

আয়ুর্বেদ ও শল্যবিদ্যারও (সার্জারি) খুব উন্নতি হয়। কি করে নানারকম অস্ত্রোপচার (অপারেশন) করতে হয় তার বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায় সুশ্রুত সংহিতাতে। একশো রকমের অস্ত্রোপচার করার যন্ত্রপাতির নাম আছে এতে। সে সময় এমনকি জন্তুদের উপরেও অস্ত্রোপচার হত। পরে গ্রীক ও আরবরা ভারতীয়দের কাছ থেকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক তথ্য শেখে।

দ্বাদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কাগজ, বারুদ, কাচ ও ধাতু শিল্পের অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ইউরোপে যোড়শ শতাব্দী থেকে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নানা দিকে বিস্ময়কর উন্নতি হতে থাকে। অবশেষে যান্ত্রিক শক্তিকে প্রচুর পরিমাণে কাজে লাগানোর ফলে হল শিল্প বিপ্লব। সেই সময় ভারত বিজ্ঞানের চর্চায় অনেকটা পিছিয়ে যায়। ভারতে আবার আধুনিক বিজ্ঞানের সূত্রপাত হয় উনবিংশ শতাব্দীতে।

আধুনিক ভারতে বিজ্ঞান

ইউরোপ থেকে বণিক ও মিশনারিরা ভারতে আসতে আরম্ভ করে যোড়শ শতাব্দী থেকেই। সেই সময় একজন পর্তুগীজ উদ্ভিদবিজ্ঞানী পশ্চিম ভারতে এসে সেখানকার গাছপালা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেন। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে শিবপুরের বোটানিকাল গার্ডেন প্রতিষ্ঠিত হল 1787 সালে। বহুদিন পর্যন্ত এই বাগান কোম্পানি বাগান নামে সাধারণ লোকের কাছে পরিচিত ছিল। ভারতের অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের মাপজোখ ও হিসেব করার জন্য কোম্পানির আমলে নানা রকম সার্ভে আরম্ভ হয়েছিল এবং অনেক নামকরা বিজ্ঞানী ইংলণ্ড থেকে ভারতে এসেছিলেন গবেষণার জন্য। কিন্তু ঐ সব গবেষণার ফলাফল ভারতীয়রা জানতে পারত না এবং কোন গুরুত্বপূর্ণ চাকরিতে ভারতীয়দের নেওয়াও হত

না। অবশ্য উইলিয়ম জোনসের মত কিছু লোক ছিলেন যাঁরা বিদেশী হলেও ভারতকে সত্যিই ভালবাসতেন। তাঁরই চেষ্টায় 1784তে কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয়, যেখানে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা করার জন্য পণ্ডিত ব্যক্তিরা মিলিত হতেন।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রাজা রামমোহন বুঝতে পারেন দেশে আধুনিক শিক্ষা বিস্তার না হলে উন্নতির আশা নেই। এজন্য সংস্কৃত ছাড়াও ইংরেজী শিখতে হবে তা না হলে বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কার ও তথ্যগুলি ভারতীয়দের ধারণার বাইরে থেকে যাবে। গণিত, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, শারীরবিদ্যা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার জন্য তিনি ইংরেজ সরকারকে অনুরোধ করেন। ঠাকুর পরিবার ও রামমোহন ইংরেজী শিখেছিলেন নিজেদের চেষ্টায়। 1781 সালে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলকাতা এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হয় 1854 এ অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের তিন বছর আগে। এইভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের বীজ বপন হল।

উনবিংশ শতাব্দী এইজন্য ভারতের বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। এই শতাব্দীর শেষের দিকে টেলিগ্রাফ লাইন ও রেল লাইন পাতা হয়। প্রথম রেল লাইন পাতা হয় বোম্বাই থেকে থানা, এই কুড়ি মাইল। তখন 1853 সাল। পনেরো বছরের মধ্যে ভারতে 1,088 মাইল রেল লাইন পাতা হয়ে গেল। 1871 সালে রেল লাইনের বিস্তৃতি হল 5,077 মাইল, আর তার পরের তিরিশ বছরে 24,760 মাইল। ভারতের প্রায় সমস্ত বড় বড় নগর, বন্দর ও খনি অঞ্চল রেল লাইন দিয়ে সংযুক্ত হল।

এই শতাব্দীর শেষের দিকেই এমন তিনজন ভারতীয় বিজ্ঞানীর আবির্ভাব হল যাঁরা নিজের নিজের ক্ষেত্রে পৃথিবী বিখ্যাত হন। এঁরা ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রীনিবাস রামানুজন।

জগদীশচন্দ্র বসু (1858-1937)

যে কজন বিজ্ঞানী গত শতাব্দীতে ভারতে আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন করলেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই জগদীশচন্দ্রের নাম করতে হয়। তখন এখানে গবেষণার ভাল যন্ত্রপাতি বা ল্যাবরেটরি ইত্যাদি কিছু ছিল না। জগদীশচন্দ্র এজন্যে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেন নি। উদ্যোগী হয়ে নিজের এক্সপেরিমেণ্টের যন্ত্রপাতি নিজেই তৈরি করে নিয়েছিলেন।



জগদীশচন্দ্র বসু

জগদীশচন্দ্রের জন্ম ময়মনসিংহে। প্রথমে ফরিদপুরের গ্রামের স্কুলে ও পরে কলকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুল ও কলেজে পড়াশোনা করেন। বি.এ. পাশ' করে ইংলণ্ডে যান। কেমব্রিজ ও লণ্ডনে পড়া শেষ করে দেশে ফেরেন ও 1885 খ্রীস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। 1915 সালে অবসর নেবার পর তিনি বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

জগদীশচন্দ্রের দুটি আবিষ্কার বিখ্যাত হয়ে আছে—তারহীন সংবাদ পাঠানো ও উদ্ভিদের প্রাণস্পন্দন রেকর্ড করা। দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে এই আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল। তখন দেশ পরাধীন। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের প্রয়োজন মত কোন সুযোগ সুবিধেই দেওয়া হত না। সুতরাং তাঁদের পক্ষে প্রতিষ্ঠা লাভ করা ছিল একরকম অসম্ভব ব্যাপার। বিশ্বের বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র তখন ইউরোপে। জগদীশচন্দ্র সেখানে বার বার গেছেন, কিন্তু বিদেশী বিজ্ঞানীরা তাঁর গবেষণার গুরুত্ব তখনো ভাল করে বুঝতে পারেন নি, বুঝেছেন আরো পঞ্চাশ বছর পরে। 1907 সালে ইতালীয় বিজ্ঞানী মার্কনি বেতারে সংবাদ পাঠানোর পেটেণ্ট

নেন, কিন্তু জগদীশচন্দ্র 1895-এই কলকাতার টাউন হলে তারহীন সংবাদ পাঠান। জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর অনেক বছর পরে যখন মাইক্রোওয়েভের আবিষ্কার হল তখন বোঝা গেল জগদীশচন্দ্র ওটা আগেই বার করেছিলেন।

আজকাল বিজ্ঞানীদের কাছে জড় ও জীবনের রহস্য খুবই কৌতূহলের বিষয়। কোথায় জড়ের শেষ ও জীবনের শুরু এই নিয়ে প্রশ্নের অন্ত নেই। জড় ও প্রাণীর মাঝখানে আছে উদ্ভিদ। উদ্ভিদের উপর স্বাভাবিক ও কৃত্রিম উত্তেজনার ফলাফল নিয়ে জগদীশচন্দ্র গবেষণা ও পরীক্ষা করেন। তাঁর নিজের উদ্ভাবিত যন্ত্রে উদ্ভিদের সূক্ষ্মতম কম্পনকে অনেক অংশে বাড়িয়ে দেখান। তাতে দেখা যায় উদ্ভিদও উত্তেজনায় কুঞ্চিত হয়ে সাড়া দেয়।

প্রফুল্লচন্দ্র রায় (1861—1944)

জগদীশচন্দ্র যে বছর বিলেতে পড়তে যান তার দুবছর পরে গেলেন প্রফুল্লচন্দ্র। তাঁর জন্ম যশোর জেলায়। স্কুলে পড়তে পড়তে তিনি ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে কয়েক বছর নষ্ট হয়। একুশ বছর বয়সে একটি বৃত্তি পেয়ে তিনি বিলেত যান ও ফিরে এসে জগদীশচন্দ্রের মতই প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াতে আরম্ভ করেন। জগদীশচন্দ্র পড়াতেন পদার্থ বিজ্ঞান আর প্রফুল্লচন্দ্র রসায়ন। সেই সময় প্রেসিডেন্সি কলেজ ছাড়া আর কোথাও নিয়মিত ভাবে রসায়ন পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল না—এমন কি এই কলেজেও ভাল যন্ত্রপাতির খুবই অভাব ছিল। কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরি থেকে হাওয়া বাইরে যাবার ভাল ব্যবস্থা ছিল না, ঘরের বাতাস ধোঁয়া আর



প্রফুল্লচন্দ্র রায়

গ্যাসে পূর্ণ হয়ে অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠত। প্রফুল্লচন্দ্রের চেষ্টায় নতুন ল্যাবরেটরি তৈরি হল। নতুন উদ্যমে গবেষণা চলতে লাগল। ছাত্রদের নিয়ে রসায়নবিদদের গোষ্ঠী গড়ে তুললেন তিনি। আজ ভারতে যে রসায়ন চর্চা চলছে তার জন্মদাতা প্রফুল্লচন্দ্র বললে বেশি বলা হয় না। এইখানেই প্রফুল্লচন্দ্র কয়েকটি নতুন যৌগিক পদার্থ আবিষ্কার করে বিশ্ববিখ্যাত হন। এই সময়ে তিনি দুই খণ্ডে হিন্দু রসায়নের ইতিহাস লেখেন।

তাঁর চেষ্টা ছিল বাঙালীদের ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পে উদ্যোগী করা। তাঁরই চেষ্টায় ভারতে সর্ব প্রথম ভারতীয়দের দ্বারা ওষুধের কারখানা স্থাপিত হয়। তার নাম বেঙ্গল কেমিকাল। তিনি নিজে খদ্দর পরতেন, অত্যন্ত সাধারণভাবে থাকতেন এবং টাকাকড়ি প্রায় সবই গরিব ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করতেন।

1922 সালে উত্তরবঙ্গে এক ভয়াবহ বন্যা হয়। প্রফুল্লচন্দ্রের বয়স তখন ষাট পেরিয়ে গেছে, তবু সমস্ত ত্রাণকার্য তিনি পরিচালনা করেন। তাঁর উপর দেশবাসীর এত বিশ্বাস ছিল যে সাত লক্ষ টাকা চাঁদা ওঠে। প্রফুল্লচন্দ্র বলতেন, বিজ্ঞান অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু স্বরাজ অপেক্ষা করবে না। সেই সময় ইংলণ্ডের একটি সংবাদপত্রে লেখা হয়, 'যদি মি. গান্ধী আর দুজন পি সি রায় তৈরি করতে পারতেন তাহলে এক বছরের মধ্যেই তিনি স্বরাজ আনতে পারতেন।'

শ্রীনিবাস রামানুজন (1887—1920)

তামিলনাড়ুর এক অখ্যাত গ্রামের এক অশিক্ষিত পরিবারে জন্ম রামানুজনের, কিন্তু তাঁর গাণিতিক প্রতিভা আশ্চর্য। মাত্র বারো বছর বয়সে তিনি লোনির ট্রিগনোমেট্রি আদ্যোপান্ত শিখে ফেলেছিলেন আর বিষুবরেখার দৈর্ঘ্য নিজে কষে বার করে শিক্ষকদের অবাক করে দিয়েছিলেন। ইউরোপের বড় বড় গাণিতিকরা অঙ্কের যে সব তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন সেগুলি এই গ্রাম্য বালকের জানার কোনই

উপায় ছিল না, কিন্তু বই বা অন্য কারো সাহায্য না নিয়ে তিনি নিজেই ঐ সব কঠিন বিষয় কষে বার করেন।


শ্রীনিবাস রামানুজন

তাঁকে চেষ্টা করে বই পড়ে কিছু শিখতে হত না—হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মত জটিল সব অঙ্কের সমাধান মাথায় খেলে যেত। অঙ্কে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে তাঁকে বৃত্তি দিয়ে কেমব্রিজে পাঠানো হয়। সেখানে তিনি পরম উৎসাহে তাঁর জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে লাগলেন।

দেশে ফিরে এলেন রামানুজন। প্রচণ্ড অর্থাভাব। কাগজ কেনার পর্যন্ত পয়সা ছিল না। স্লেটে অঙ্ক কষতেন। ছোটবেলা থেকে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে শরীর ভেঙে গিয়েছিল। মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে তিনি যক্ষ্মারোগে মারা যান।

সভ্যতার আদি যুগে ভারতেরই কোন একজন গাণিতিক শূন্যের ধারণা প্রথম উদ্ভাবন করেন। সেই যুগে গণিতে ভারত ছিল পৃথিবীর শীর্ষ স্থানে। রামানুজনের সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক গণিতের ক্ষেত্রে আর একবার ভারতের নাম উচ্চারিত হতে শোনা গেল। বিশ্ববিখ্যাত অঙ্কবিদ হার্ডি বলেছিলেন, 'যখন আমি ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে পড়ি তখন এই কথা মনে করে অনুপ্রেরণা পাই যে আমি রামানুজনের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করেছিলাম।'

অত্যন্ত অল্প বয়সে মারা যাওয়ায় রামানুজন কোন ছাত্রগোষ্ঠী তৈরি করে যেতে পারেন নি।

বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান

এই শতাব্দীর গোড়াতেই দেখা যায় আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে

প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতনতা। এইবার ভারতে বিজ্ঞানের যথার্থ নবজাগরণ আরম্ভ হল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্. এস সি. পড়ানো শুরু হয় 1913 সালে। তবে জমি তৈরি ছিল, তাই ফসল ফলতে দেরি হল না। এই শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বছরের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হল—সাহার তাপ আয়নন তত্ত্ব (1920), বোস সংখ্যায়ন (1924) ও রামন প্রভাব (1930)। এছাড়াও যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন সংখ্যাতত্ত্বে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, রসায়নে জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শান্তিস্বরূপ ভাটনাগর, উদ্ভিদ বিজ্ঞানে বীরবল সাহনি, পরমাণু বিজ্ঞানে হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা, বেতার বিজ্ঞানে শিশিরকুমার মিত্র ইত্যাদি।

মেঘনাদ সাহা (1893-1956)

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত প্রতিভাবান ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম মেঘনাদ সাহা, যদিও তাঁর প্রতিভা ছিল পদার্থবিজ্ঞানে। আচার্যদেবের মত তিনিও সারা জীবন বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে দেশের কল্যাণমূলক বহু কাজে আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন, বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন, বহু পরিকল্পনা তৈরি করেছেন।


মেঘনাদ সাহা

ঢাকার কাছে শ্যাওড়াতলী নামে এক গণ্ডগ্রামে এক মুদীর ঘরে তাঁর জন্ম। সেখান থেকে নিজের বুদ্ধি, চেষ্টা ও পরিশ্রমে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ পর্যন্ত পৌঁছনো খুব সহজ ছিল না। অর্থাভাব ছাড়াও সামাজিক নির্যাতন তাঁকে কম সহ্য করতে হয় নি।

তিনি কলকাতায় এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন 1911 সালে। এই কলেজে তখন ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে এমন গুণীদের সমাবেশ হয়েছিল যা কদাচিৎ ঘটে। পদার্থবিজ্ঞানে অধ্যাপক ছিলেন জগদীশচন্দ্র, রসায়নে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, গণিতে অধ্যাপক ডি. এন্. মল্লিক। ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, প্রশান্ত মহলানবিশ, নীলরতন ধর, নিখিলরঞ্জন সেন, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বাঙলায় তখন আধুনিক বিজ্ঞানের যুগসন্ধিক্ষণ। মিশ্র গণিতে এম. এস সি. পাশ করার পর সার আশুতোষের অনুরোধে মেঘনাদ সদ্যপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান কলেজে পড়াতে আরম্ভ করলেন—প্রথমে ফলিত গণিত, পরে পদার্থবিজ্ঞান। 1920 সালে প্রকাশিত হল তাঁর তাপ আয়নন তত্ত্ব, যা জ্যোতির্পদার্থ বিজ্ঞানে এক যুগান্তকারী আবিষ্কার বলে স্বীকৃত। সেই বছর গুরুপ্রসন্ন বৃত্তি নিয়ে তিনি ইংলণ্ডে গেলেন। দেশে ফিরে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। দীর্ঘ ষোল বছর কাটে এলাহাবাদে। এখানে তাঁকে ঘিরে গড়ে ওঠে এক সুযোগ্য ছাত্র-গোষ্ঠী, তাঁদের অনেকেই আজ ভারতীয় বিজ্ঞানের শীর্ষস্থানে। 1938 সালে সাহা কলকাতায় ফেরেন। মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে তিনি ফেলো অফ দি রয়াল সোসাইটি নির্বাচিত হন। গবেষণা ও শিক্ষকতা ছাড়াও আরো নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর বহুমুখী কর্মজীবন। ন্যাশনাল একাডেমী অফ সায়েন্স, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স, সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন, সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার পত্রিকা প্রভৃতি তাঁরই চেষ্টায় গড়ে ওঠে। বহু বিজ্ঞান সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে বহু দেশ ঘুরে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তিনি। 1936 সালে তিনি গিয়েছিলেন কোপেনহেগেনে অধ্যাপক নীল্‌স বোরের ল্যাবরেটরিতে। তখন পরমাণুর গঠন নিয়ে নানা রকম নতুন আবিষ্কার হচ্ছে। বিজ্ঞানী মহলে হৈ চৈ পড়ে গেছে। মিউনিকের এক ল্যাবরেটরির দরজায় ঠাট্টা করে নোটিশ ঝোলানো হল, 'সাবধান, এখানে বস্তু ভেঙে নতুন করে তৈরি হচ্ছে!' সাহা

তখনই বুঝতে পেরেছিলেন পরমাণু বিজ্ঞানের কি বিপুল সম্ভাবনা। দেশে ফিরে অনেক চেষ্টায় তিনি গড়ে তোলেন ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স। সাহার মৃত্যুর পর তার নাম হয়েছে সাহা ইনস্টিটিউট।

সুভাষচন্দ্র ও নেহরুর সঙ্গে স্বাধীনতার আগে থেকেই তিনি জাতীয় উন্নতির জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনার খসড়া তৈরি করেন। উত্তরবঙ্গের বন্যার সময় তিনি প্রফুল্লচন্দ্রকে ত্রাণকার্যে সাহায্য করেছিলেন। নদীর সর্বনাশা শক্তিকে কি করে বশীভূত করে মানুষের উপকারে লাগানো যায় সেই চিন্তা থেকে জন্ম নেয় দামোদর পরিকল্পনার বীজ। ইউরোপে বিজ্ঞানের নবজাগরণ দেখে এসে তিনি চেষ্টা করেছিলেন সেই ধারাকে স্বদেশে প্রবাহিত করতে। কি করে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর ও পদ্ধতির প্রয়োগ করে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতি করা যায় সেই নিয়ে তিনি ক্রমাগত চিন্তা করেছেন। পঞ্জিকা সংস্কার তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। 1956 সালে দিল্লীতে হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হয়।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু (1894-1974)

নিউটনের গতিবিজ্ঞানকে অতিক্রম করার কথা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ অবধি কেউ ভাবতেই পারত না। ক্রমে পরমাণু সম্বন্ধে নানা তথ্য আবিষ্কার হতে লাগল, তখন দেখা গেল তাপ বিকিরণের নিয়মকানুনগুলো একটু বদলাবার দরকার হয়ে পড়েছে। আলোক-বিজ্ঞানেও সেই অবস্থা। 1900 সালে ম্যাক্স প্ল্যাংক তাঁর বিখ্যাত কোয়ান্টাম থিয়রি বা শক্তিকণাবাদ উপস্থিত করলেন। এইসব ঘটনার ফলে পদার্থবিজ্ঞানে একটা পালাবদল আরম্ভ হল।

এই পালাবদলের সময় সত্যেন্দ্রনাথ বসু একটি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। 1924 সালে একটি জার্মান পত্রিকায় তিনি একটি ছোট্ট প্রবন্ধ লেখেন—তখনো পর্যন্ত তিনি বিজ্ঞানের জগতে অপরিচিত। প্রবন্ধের বিষয় প্ল্যাংকের সূত্র ও আলোর কোয়ান্টামবাদ।

প্রবন্ধটির জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন বিজ্ঞানী আইনস্টাইন। প্রবন্ধের শেষে তিনি নিজের অভিমত যোগ করে দেন—আমার মতে প্ল্যাংকের এই সূত্র প্রমাণে বোসের পদ্ধতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রবন্ধের উপর ভিত্তি করেই বোস সংখ্যায়ন তত্ত্ব।



সত্যেন্দ্রনাথ বসু

বোস সংখ্যায়ন এক ধরনের মৌল কণার বিশিষ্ট ধর্ম। যে সব মৌল কণায় এই ধর্ম বর্তমান তাদের সত্যেন বসুর নাম অনুসারে বলা হয় বোসন। মৌল কণা নিয়ে যত গবেষণা এগিয়েছে ততই বোস সংখ্যায়ন তত্ত্বের গুরুত্ব বোঝা গেছে। সেজন্য অনেক দেরিতে তাঁকে ফেলো অফ দি রয়াল সোসাইটি করা হয়। এফ. আর. এস. হওয়া বিজ্ঞানীদের পক্ষে খুবই সম্মানের ব্যাপার।

সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম ও শিক্ষা কলকাতায়। বি. এস সি. ও এম. এস সি. দুটি পরীক্ষাতেই তিনি প্রথম বিভাগে প্রথম হয়েছিলেন। তারপর কিছুদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়ে চলে যান ঢাকা। 1945 সালে তিনি খয়রা অধ্যাপক হয়ে কলকাতায় ফেরেন। 1956 এ অবসর নেবার পর তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্য হন। তিন বছর সেখানে থাকার পর তাঁকে জাতীয় অধ্যাপক মনোনীত করা হয়। এটি বিজ্ঞানে ভারতের সবচেয়ে সম্মানের পদ। 1974 সালে আশী বছর বয়সে তিনি মারা যান।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু বহুবার বিদেশে গেছেন এবং মাদাম কুরী, আইনস্টাইন প্রমুখ বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের সংস্পর্শে এসেছেন। কিন্তু তাঁর বোস সংখ্যায়ন আবিষ্কার হয় বিদেশ যাত্রার বহু আগে। প্রকৃত মেধার কাছে যে কোন বাধাই বাধা নয় সত্যেন্দ্রনাথ তার আর একটি প্রমাণ।

সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভা বহুমুখী। পদার্থবিদ্যা ছাড়াও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি গবেষণা করেছেন। ইতিহাস, সংগীত, সাহিত্যেও তাঁর সমান অনুরাগ ছিল। অনেক ভাষা জানতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল বিজ্ঞান শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা হওয়া উচিত। সেজন্য তাঁরই উদ্যোগে 1948 সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এমনকি নিজে এম. এস সি. ক্লাসে বাংলায় পড়িয়ে তিনি সকলকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন বিজ্ঞান আলোচনার বাহন সব স্তরে বাংলা হওয়া সম্ভব।

চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন (1888—1970)

চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন 1907 সালে মাদ্রাজ থেকে এম. এ. পাশ করেন। সেই সময় পেশা হিসেবে বিজ্ঞান গবেষণার কথা কেউ ভাবতেও পারত না। সুতরাং পরীক্ষায় ভাল করলেও তিনি শেষ অবধি সরকারী চাকরি নিয়ে কলকাতায় এলেন।

কলকাতায় চাকরি করার সময় তিনি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে নিজের চেষ্টায় অবসর সময়ে গবেষণা আরম্ভ করেন। যখন তাঁর বয়স উনত্রিশ সেই সময় সার আশুতোষ তাঁকে পালিত অধ্যাপক পদ নেবার জন্য ডাকলেন। রামন সাগ্রহে সরকারী চাকরি ছেড়ে সেই পদ গ্রহণ করলেন।



চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন

প্রথমে তিনি বেহালার তার নিয়ে কাজ করে খ্যাতি অর্জন করেন। পরে তিনি আলোর বিক্ষেপণ নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করলেন। বাতাসে অসংখ্য ধূলিকণা আছে। সূর্যের আলো এই কণাগুলির উপর এসে পড়ে চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। স্বচ্ছ বস্তু অথবা তরলের ভিতর দিয়ে গেলেও আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনাকে বলে আলোর বিক্ষেপণ। বিক্ষেপণের একটি

বিশেষ প্রভাব আবিষ্কার করার জন্য 1930 সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। এই আবিষ্কার রামন প্রভাব বা রামন এফেক্ট নামে বিখ্যাত। তোমরা হয়ত জান ভারতে কাজ করে আর কোন বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পান নি। তবে একজন ভারতীয় যিনি আমেরিকায় বাস করেন, আণবিক জীবতত্ত্ব বিষয়ে কাজ করে 1970 সালে নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর নাম হরগোবিন্দ খোরানা।

রামন প্রভাবের সাহায্যে জৈব পদার্থের আণবিক গঠনের বিশ্লেষণ সম্ভব হয় বলে এটি বহুল পরিমাণে ব্যবহার হয়। সেই-জন্যই রামনের কাজের স্বীকৃতি পেতেও দেরি হয়নি।

1943তে তিনি বাঙ্গালোরে রামন রিসার্চ ইনস্টিটিউট স্থাপন করেন। তিনি জাতীয় অধ্যাপক হন 1948 এ, 1954 এ আমাদের দেশের সর্বোচ্চ সম্মান ভারতরত্ন তাঁকে দেওয়া হয়।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ (1893-1972)

জন্ম কলকাতার এক ব্রাহ্ম পরিবারে। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এস সি. পাশ করে তিনি কেমব্রিজে যান অঙ্ক ও পদার্থ-বিজ্ঞান পড়তে। বছর দুই বাদে ফিরে আসেন। তখন থেকেই তাঁর মনে বিজ্ঞানের একটি নতুন শাখা, স্ট্যাটিস্টিক্স্ বা পরিসংখ্যানের চিন্তা দানা বাঁধছে।



প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

এই নতুন শাখাটি একটি পদ্ধতির মত—যা প্রয়োগ করে নানা ধরনের বিষয়ে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা চালানো যায়। মহলা-নবিশ ওড়িশা ও উত্তরবঙ্গের বন্যার কারণ নির্ণয় করার জন্য তথ্য সংগ্রহ করেন ও এই পদ্ধতিতে সেই তথ্য বিশ্লেষণ করেন। পঞ্চাশের মন্বন্তরের কারণ

বার করার জন্যও তিনি একই উপায় অবলম্বন করেন। পাট উৎপাদন কত হবে এই বিষয়েও তিনি কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করেন। এইভাবে তিনি হাতেকলমে বহুবার কৃষি, অর্থনীতি, আবহবিজ্ঞান ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে দেখিয়ে দেন পরিসংখ্যান এমন একটি পদ্ধতি যাকে যে কোন বিষয়ে ব্যবহার করা যায়। এই পদ্ধতির গুরুত্ব বুঝতে পেরে তিনি 1932 তে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা করেন। আজকালকার যন্ত্রনির্ভর সভ্যতার নানা সমস্যার সমাধান করতে পরিসংখ্যানের ব্যবহার হতে পারে। তাই তাঁর চেষ্টায় গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানে রসায়ন, জীবতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি নানা রকম বিষয়ে গবেষণা হয়। একই প্রতিষ্ঠানে এত বিভিন্ন শাখায় কাজ অন্য কোথাও বড় একটা দেখা যায় না।

ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী যোজনার খসড়া তৈরির সময়েও মহলানবিশ অনেক সাহায্য করেছিলেন। আমাদের দেশ যেমন বিশাল, তেমনি তার অর্থনৈতিক সমস্যাগুলিও প্রকাণ্ড আকারের। অর্থনীতির মূল বিষয়গুলি নিয়ে মহলানবিশ প্রথমে একটি প্রাথমিক খসড়া তৈরি করেন। তিনি নিজেকে বলতেন সংখ্যার এঞ্জিনিয়র। প্রায় কুড়ি বছর তিনি ভারত সরকারের পরিসংখ্যান বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন।

জীবনে বহু সম্মান লাভ করেছেন তিনি। 1945 এ তিনি ফেলো অফ দি রয়াল সোসাইটি হন। বায়োমেট্রিতে তাঁর কাজের জন্য তিনি 1944 এ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুরস্কার পান।

পঞ্চাশের দশকে তিনি সারা দেশ জুড়ে পরিসংখ্যান তথ্য সংগ্রহের একটা অভিযান আরম্ভ করেন। এই কাজ এখনো চলছে। এই কাজের জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় স্ট্যাটিসটিকাল ব্যুরো স্থাপিত হয়। এ ছাড়া 'সংখ্যা' নামক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা তিনি। ভারতে বিজ্ঞানের এই নতুন শাখার প্রবর্তক হিসেবে মহলানবিশের নাম অমর হয়ে থাকবে।

হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা (1909—1966)

আধুনিক ভারতে বিজ্ঞানকে যাঁরা জনসাধারণের জীবনের অঙ্গ করে তুলেছেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় হোমি জাহাঙ্গীর ভাবার।

বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর যা অবদান শুধু তার জন্যও তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকতেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তার চেয়েও বেশি সদ্যস্বাধীন ভারতে গঠনমূলক গবেষণার কাজে বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করে তিনি ভারতে পরমাণু যুগের সূচনা করেছেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে তিনিই ভারতীয় বিজ্ঞানের অন্তত একটি শাখা পরমাণু বিজ্ঞানকে সাবালক ও আধুনিক করে তুলেছেন।



হোমি ভাবা

স্বাধীনতা পাওয়ার পর আমাদের দেশে পারমাণবিক শক্তি কমিশন তৈরি হল, ভাবা এই কমিশনের নেতৃত্বের ভার নিলেন। আধুনিক বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে কিভাবে জীবনকে সহজ ও সুন্দর করে তোলা যায় এই নিয়ে অনেক ভাবনা চিন্তা ও পরিকল্পনা আরম্ভ হল। দেখা গেল শক্তি উৎপাদনের জন্য কয়লা পেট্রোলিয়ম ইত্যাদি যা প্রাকৃতিক সম্পদ আমাদের আছে তা প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তার মানে ইচ্ছে করলেই আমরা গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ চালিত পাম্প, আলো ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি দিতে পারব না, কারণ বিদ্যুৎ যা থেকে তৈরি হবে সেই জ্বালানীতে শিগগিরিই টান পড়বে। আমাদের পক্ষে তাই একমাত্র উপায় পারমাণবিক জ্বালানী থেকে শক্তি তৈরি করা, কারণ এর উপাদান ইউরেনিয়ম ও থোরিয়ম আমাদের দেশে যথেষ্ট আছে। কিভাবে তাদের কাজে লাগিয়ে তা থেকে শক্তি উৎপন্ন করা হবে? এই কাজের জন্য

যোগ্য কারিগর, বিজ্ঞানী ও এঞ্জিনিয়র দরকার। সুতরাং এক বিরাট কার্যক্রম হাতে নেওয়া হল। এ সবেরই মূলে ছিল ভাবার চেষ্টা। পরমাণু থেকে শক্তি উৎপাদনের কথা শুনে তখন অনেকে হেসেছিলেন—কিন্তু বেশি দিন গেল না, আজ যেরকম বিদ্যুৎ সংকটের মধ্যে আমরা পড়েছি তাতে প্রমাণ হয়ে গেল ভাবার অনুমান কতটা ঠিক ছিল, ভাবার পরিকল্পনা অনুযায়ী পরমাণু বিদ্যুতের অনেকগুলি কারখানা চালু হয়ে গেলে আজ আমাদের বিদ্যুতের অভাবে এত অসুবিধা ভোগ করতে হত না। বিজ্ঞানের সাহায্যে দেশের উন্নতির স্বপ্ন দেখা এক আর সেই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করা আর এক জিনিস। ভাবা প্রমাণ করেছিলেন যে এই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা আমাদের আছে।

1909 সালে একটি বিখ্যাত পার্শী পরিবারে তাঁর জন্ম। বোম্বাইয়ে লেখাপড়া আরম্ভ করেন। মাত্র সতেরো বছর বয়সে তিনি কলেজে পড়ার জন্য বিলেতে যান। কেমব্রিজ থেকে ডক্টরেট লাভ করেন। মহাজাগতিক রশ্মি বা কসমিক রে নিয়ে গবেষণা করে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। 1940 তে ভারতে ফিরে তিনি প্রথমে বাঙ্গালোরে গবেষণা করতে থাকেন ও পরে বোম্বাইয়ে টাটা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। ভারত স্বাধীন হবার পর তিনি পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান হন। 1966 সালে এক বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় গবেষণার ক্ষেত্রে ভাবা প্রতিষ্ঠিত ভারতের পারমাণবিক শক্তি কমিশন ও ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র সারা পৃথিবীতে প্রথম সারিতে পড়ে। 1974 সালের 18 মে ভূগর্ভস্থ পরমাণু বিস্ফোরণের পরীক্ষাই তার প্রমাণ।

প্রশ্ন

1. বিজ্ঞান কাকে বলে? বিজ্ঞানের প্রয়োজন কোথায়? আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব কি ভাবে বোঝা যায় বল।

2. প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান চর্চার উদাহরণ দাও। কয়েকজন প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানীর নাম কর ও তাঁরা কি জন্য বিখ্যাত বল।

3. ভারতবর্ষের বাইরে অন্য কোন কোন দেশে বিজ্ঞান উন্নতি লাভ করেছিল? এ সম্বন্ধে যা জান বল।

4. কোন ভারতীয় বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন? তাঁর আবিষ্কারের নাম কি? এই বিজ্ঞানী ও তাঁর আবিষ্কার সম্বন্ধে যা জান লেখ।

5. অন্য যে সব ভারতীয় বিজ্ঞানী মৌলিক গবেষণার জন্য বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁদের নাম ও তাঁদের আবিষ্কার সম্বন্ধে যা জান বল।

6. নিচের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং আবিষ্কারগুলির সঙ্গে একজন বিজ্ঞানীর নাম জড়িত। বাঁদিকে তত্ত্ব বা আবিষ্কার এবং ডানদিকে সঠিক উত্তর মেলাও।

(a) স্টীম এঞ্জিন	(i) জগদীশচন্দ্র বসু
(b) পেনিসিলিন	(ii) মহলানবিশ
(c) পাস্তুরীকরণ	(iii) লুই পাস্তুর
(d) মাইক্রোওয়েভ	(iv) জর্জ স্টিভেনসন
(e) সংখ্যা বিজ্ঞান	(v) ফ্লেমিং

7. ভুল সংশোধন কর:

(ক) শূন্যের ধারণা প্রথম এসেছিল মিশরীয়দের মনে

(খ) ব্রহ্মগুপ্তের জন্ম পাটলিপুত্র শহরে

(গ) এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন রাজা রামমোহন রায়

(ঘ) কয়েক ধরনের মৌল কণা আবিষ্কার করেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

(ঙ) রামন যে আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পান তার নাম তাপ আয়নন তত্ত্ব

(চ) হিন্দু রসায়নের ইতিহাস বইএর লেখক মেঘনাদ সাহা

8. বাঁদিকের কোন প্রতিষ্ঠানটি ডান দিকের কোন বিজ্ঞানী প্রতিষ্ঠা করেন?

(ক) বসু বিজ্ঞান মন্দির	(i) প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ
(খ) এশিয়াটিক সোসাইটি	(ii) মহেন্দ্রলাল সরকার
(গ) ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স	(iii) সি. ভি. রামন
(ঘ) ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স	(iv) হোমি ভাবা
(ঙ) ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউট	(v) উইলিয়াম জোনস

(চ) রামন রিসার্চ ইনস্টিটিউট (vi) জগদীশচন্দ্র বসু

(ছ) টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফাণ্ডামেন্টাল রিসার্চ (vii) মেঘনাদ সাহা

(জ) বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ (viii) সত্যেন্দ্রনাথ বসু

9. বিজ্ঞানী হিসেবে কার অবদান বেশি? লিওনার্দো দা ভিঞ্চি না গ্যালিলিওর ? কেন ?

10. সঠিক উত্তর দাও :

(ক) স্টীম এঞ্জিন আবিষ্কার করেন	জেমস ওয়াট/জর্জ স্টিভেনসন
(খ) বোস সংখায়নের তত্ত্ব প্রথম দেন	জগদীশচন্দ্র বসু/সত্যেন্দ্রনাথ বসু
(গ) বেতার প্রথম আবিষ্কার করেন	জগদীশচন্দ্র বসু/মার্কনি
(ঘ) বাইরের উত্তেজনায় উদ্ভিদ সাড়া দেয় পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেন।	প্রফুল্লচন্দ্র রায়/জগদীশচন্দ্র বসু
(ঙ) হিন্দু রসায়নের ইতিহাস বইএর লেখক	প্রফুল্লচন্দ্র রায়/আর্যভট
(চ) তাপ আয়নন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন।	হোমি ভাবা/মেঘনাদ সাহা

11. কেন ? (তিন চার লাইনে উত্তর দাও)

(ক) পিসার হেলান মন্দিরের উপর থেকে একই আয়তনের দুটো বল গ্যালিলিও মাটির দিকে ছুড়ে দেন।

(খ) স্নান করতে করতে আর্কিমিডিস 'পেয়েছি' 'পেয়েছি' বলে চীৎকার করে ওঠেন।

12. গ্যালিলিওর দুটো বিখ্যাত আবিষ্কার সম্বন্ধে যা জান লেখ।

13. শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

(ক) আর্যভট জন্মগ্রহণ করেন — শহরে আনুমানিক — সালে।

(খ) — সালে — পুরস্কার পান সি. ভি. রামন।

(গ) ভারতে প্রথম বোট্যানিকাল গার্ডেন প্রতিষ্ঠিত হয় — শহরে — সালে।

(ঘ) ব্রহ্মগুপ্তের জন্ম আনুমামিক — সালে, বাস করতেন — শহরে।

(ঙ) ভারতে প্রথম রেলপথ প্রতিষ্ঠিত হয় — সালে।

(চ) জগদীশচন্দ্র বসু প্রথম তারহীন সংবাদ পাঠান — সালে।

(ছ) বোস সংখ্যায়ন তত্ত্ব প্রকাশিত হয় — সালে।

(জ) তাপ আয়নন তত্ত্ব প্রকাশিত হয় — সালে।

(ঝ) ভারতে প্রথম পরীক্ষামূলক পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটে — সালে।

14. দুজন বিজ্ঞানীর নাম কর যাঁরা—

(ক) প্রাচীন ভারতে বাস করতেন।

(খ) প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করতেন।

(গ) বাংলাদেশের অধিবাসী ছিলেন।

(ঘ) তামিলনাড়ুতে জন্মগ্রহণ করেন।

(ঙ) নিউটনের আগে জন্মেছিলেন এবং পৃথিবীর আহ্নিক গতিতে বিশ্বাস করতেন।

(চ) ভারতে জন্মেছেন এবং নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

15. নিউটনের আবিষ্কার সম্বন্ধে যা জান লেখ।

16. সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :

ভাস্করাচার্য, আর্যভট, ব্রহ্মগুপ্ত, বৈশেষিক দর্শন, আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং, ভারতে পরমাণু গবেষণা।

---

২ বাতাস

বাতাসের উপাদান

পৃথিবীকে ঘিরে আছে বিভিন্ন গ্যাসের মিশ্রণ, যার নাম বায়ুমণ্ডল, সংক্ষেপে বাতাস। কি কি গ্যাস দিয়ে বাতাস তৈরি? একটা পরীক্ষা করে দেখা যাক—

জল ভর্তি একটা প্লেটের মধ্যে একটা আধুলি ফেলো। হাত না ভিজিয়ে ঐ আধুলিটা তোলা যাবে কি? যাবে। তার জন্যে একটা আলু নিয়ে প্লেটে বসাও। আলুর উপর দুটি দেশলাইয়ের কাঠি গুঁজে তাতে আগুন দাও। এবার ঐ আলু ও জ্বলন্ত কাঠিদুটি একটা গেলাস চাপা দাও (চিত্র 2.1)। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাঠি দুটি নিভে যাবে ও গেলাসের বাইরের জল গেলাসের ভিতরে চলে আসবে। সুতরাং তুমিও অতি সহজে আঙুল না ভিজিয়ে আধুলিটি তুলে ফেলতে পারবে।



চিত্র 2.1

কি করে এটা হল? একটু আগেই বলা হয়েছে বাতাস কয়েকটি গ্যাসের মিশ্রণ। তার মধ্যে একটা হল অক্সিজেন। এই গ্যাস আগুনকে জ্বলতে সাহায্য করে। দেশলাই কাঠি দুটি জ্বলার

ফলে গেলাসের ভিতরে যে বাতাস ছিল তার খানিকটা অক্সিজেন খরচ হয়ে গেল। সেই ফাঁকা জায়গাটা ভর্তি করল বাইরের জল এসে।

অক্সিজেন হল বাতাসের একটি প্রধান উপাদান। আর একটি প্রধান উপাদান নাইট্রোজেন। এ ছাড়া বাতাসে বাকি যা গ্যাস আছে তার পরিমাণ খুবই অল্প। এগুলির নাম আর্গন, নিয়ন, হিলিয়ম প্রভৃতি। এদের পরিমাণ এই রকম :

			আয়তন অনুযায়ী শতকরা হিসেব
নাইট্রোজেন	—	—	78·09
অক্সিজেন	—	—	20·93
আর্গন	—	—	0·93
কার্বন ডাইঅক্সাইড	—	—	0·03
নিয়ন	—	—	0·0018
হিলিয়ম	—	—	0·0005
ক্রিপটন	—	—	0·0001
হাইড্রোজেন	—	—	0·00005
জেনন	—	—	0·000008
ওজোন	—	—	0·00005

তাছাড়া জলীয় বাষ্পও কিছু আছে। বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ নির্ভর করে সেই অঞ্চলে নদী, নালা, হ্রদ বা উপসাগর ইত্যাদি থাকার উপর। গরম কালে যখন খুব চটচটে আবহাওয়া হয় তখন কাগজে বেরোয় আর্দ্রতা শতকরা নব্বই ভাগ বা ঐরকম কিছু। তার মানে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ খুব বেড়েছে। এই রকম অবস্থায় ভিজে জামাকাপড় তাড়াতাড়ি শুকোয় না।

বায়ুদুষ্টি

এই কথাটি আজকাল প্রায়ই শোনা যাচ্ছে। এর মানে বায়ু দূষিত হয়ে যাওয়া। এই বিষয়টির সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের উপাদানের

সম্পর্ক আছে। বাতাস দূষিত হয়ে যাওয়া বা বায়ুদুষ্টি নিয়ে এত দুশ্চিন্তার কারণ কি? আমরা নিঃশ্বাস ফেলার সময় কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করি। জীবন্ত প্রাণীর প্রশ্বাস, জ্বালানীর দহন আর জৈব বস্তুর ক্ষয়, এই তিন ভাবে প্রকৃতিতে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হচ্ছিল। সবুজ উদ্ভিদ সূর্যের আলোর সাহায্যে বাতাস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড শুষে নেয়। এই প্রক্রিয়াকে বলে **সালোক-সংশ্লেষ** বা ফোটোসিন্‌থেসিস। এর ফলে উদ্ভিদের দেহ থেকে বার হয় অক্সিজেন আর কার্বন এসে প্রবেশ করে উদ্ভিদের দেহে। গাছ-পালা মরে গেলে কিংবা শুকনো কাঠ পোড়ালে এই কার্বন আবার কার্বন ডাইঅক্সাইড হয়ে হাওয়ায় মিশে যায়। এইভাবে প্রকৃতিতে একটা ভারসাম্য বজায় থাকে। কিন্তু গত শতাব্দী থেকে কল-কারখানা ও পেট্রল চালিত যানবাহনের সংখ্যা ক্রমে বেড়েই গেছে, সেই সঙ্গে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণও বেড়েছে। এই কার্বন ডাইঅক্সাইড হয়ে যাচ্ছে বাড়তি এবং এর দ্বারা বাতাস ক্রমেই বিষাক্ত হচ্ছে।

বায়ুমণ্ডল

পৃথিবীকে ঘিরে আছে বায়ুমণ্ডল, তবে ঠিক কতদূর পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলের বিস্তৃতি সেটা ঠিক করে বলা খুবই কঠিন। পৃথিবীর উপরে প্রায় 320 কিলোমিটার পর্যন্ত এর অস্তিত্ব আছে বলে জানা গেছে। বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কমে প্রায় 10 থেকে 12 কিলোমিটার পর্যন্ত। এই অঞ্চলে তাপমাত্রা কমা-বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুপ্রবাহ দেখা দেয়। এই অঞ্চলকে বলে **ক্ষোভমণ্ডল** বা **ট্রপোস্ফিয়ার**। এই অঞ্চলের ঠিক উপরের অঞ্চলকে বলে **সমতাপমণ্ডল** বা **স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার**। এই মণ্ডলের তাপ—55° সেন্টিগ্রেড এবং সমস্ত অঞ্চলে তাপের কোন পরিবর্তন নেই। সেইজন্য এই অঞ্চলে বায়ুপ্রবাহ, মেঘ বা ঝড় দেখা যায় না। সম-তাপমণ্ডলের উপরের অংশের নাম **আয়নমণ্ডল** বা **আয়নোস্ফিয়র**।

এখানে হালকা গ্যাস হাইড্রোজেন, হিলিয়ম ও ওজোন বেশি পরিমাণে আছে এবং আয়নিত অবস্থায় আছে।

বায়ুমণ্ডল শুধু যে আমাদের নিঃশ্বাসের হাওয়া জোগায় তাই নয়, এর জন্য আমরা দিনে প্রচণ্ড গরম ও রাতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষা পাই। কারণ বাইরে থেকে আসা তাপ নিয়ন্ত্রণ করে ও পৃথিবীপৃষ্ঠের তাপ ধরে রেখে বায়ুমণ্ডল কম্বলের কাজ করে। চাঁদে কোন বায়ুমণ্ডল নেই, তাই সেখানে দিনে প্রচণ্ড গরম ও রাতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। এছাড়া মহাজাগতিক রশ্মি, ধূমকেতু আর উল্কাচূর্ণ বায়ুমণ্ডলে বাধা পাচ্ছে বলেই সোজা এসে পৃথিবীতে আছড়ে পড়ছে না। বায়ুমণ্ডল যেখানে শেষ সেখানে মহাশূন্য আরম্ভ। মহাশূন্যে হাওয়া নেই, হাওয়া না থাকার জন্য শব্দও নেই।

বাতাসের ওজন

বিভিন্ন গ্যাসের মিশ্রণে বাতাস তৈরি। তাই সব বস্তুর মত বাতাসেরও ওজন আছে। এই ওজন থাকার জন্য বাতাস সর্বত্র সমান চাপ দিচ্ছে। সেটা আমরা সাধারণত বুঝতে পারি না, কারণ আমাদের আশেপাশে মাথার উপর সব জায়গায় বাতাসের চাপ একই রকম। এই ওজন থাকার জন্য বাতাস সর্বত্র সমান চাপ দিচ্ছে, সেটাও আমরা বুঝতে পারি না। কিন্তু সাইকেলের টায়ারে যখন হাওয়া পাম্প করে ঢোকানো হয় তখন তার মধ্যে চারপাশের বাতাসের চেয়ে বেশি চাপের সৃষ্টি হয়। বাতাসের চাপ আছে বলেই কেউ প্যারাস্যুট নিয়ে লাফালে ভাসতে ভাসতে নামে, সোজা এসে মাটিতে আছাড় খায় না। পাখি, প্লেন ইত্যাদি ওড়বার সময় হাওয়ার চাপকে কাজে লাগায়। মশা মারবার জন্য ওষুধ স্প্রে করার সময়ও হাওয়ার চাপকে কাজে লাগানো হচ্ছে। আর কি কি ভাবে আমরা হাওয়ার চাপকে কাজে লাগাই ?

বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর কাছে ভারি ও ঘন, যত উপরে উঠেছে তত হালকা ও পাতলা হয়েছে। উলটো করে ভেবে দেখলে, প্রায়

1000 কিলোমিটার বিস্তৃত হাওয়ার চাপ পড়েছে বলেই নিচের স্তরের হাওয়াকে ভারি ও ঘন হতে হয়েছে। সংক্ষেপে, পৃথিবীপৃষ্ঠে বাতাসের ঘনত্ব ও চাপ সবচেয়ে বেশি। বাতাসের ঘনত্ব কমতে কমতে কোন এক জায়গায় মহাশূন্যে মিশে গেছে। ঘনত্ব সম্বন্ধে তোমরা চতুর্থ অধ্যায়ে আরো পড়বে।

বাতাসের ওজন মাপা

বাতাসের ওজন প্রথম মাপার চেষ্টা করেন অটো ফন গেরিক নামে একজন বিজ্ঞানী। তিনি একটা কাচের ফ্লাস্ক নেন—তার মুখে একটি নল ও নলের স্টপ কক লাগানো (চিত্র 2.2)। একটি বায়ু নিষ্কাশন যন্ত্রের সাহায্যে ফ্লাস্ক থেকে বাতাস বার করে তিনি তার ওজন নেন। পরে স্টপ কক খুলে বাতাস ভর্তি করে নিয়ে আর একবার ওজন নেন। দুটি ওজনের বিয়োগ ফল হল ফ্লাস্কের ভিতরের হাওয়ার ওজন। তবে এই পার্থক্য এত কম যে খুব সূক্ষ্ম তুলা-যন্ত্র ছাড়া মাপা সম্ভব নয়।



চিত্র 2.2

তোরিচেলির পাম্প

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইতালিতে টাসকানি রাজ্যে এক ডিউক ছিলেন। তিনি বাগানে জল তোলার জন্য একটি নতুন পাম্প বসান, কিন্তু কাজের সময় দেখা গেল তা থেকে জল উঠছে না। পাম্পটি যারা তৈরি করেছিল তাদের ফেরত পাঠান হল, কিন্তু তাদের কুয়োতে লাগাবার পর তা থেকে দিব্যি জল উঠল, তাহলে ডিউকের কুয়ো থেকে জল ওঠে না কেন? ডাক পড়ল বিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্যালিলিওর। গ্যালিলিও পরীক্ষা করে দেখলেন কুয়ো 10.37 মিটার অর্থাৎ প্রায় সাড়ে দশ মিটার গভীর হলে জল উঠছে, কিন্তু তার

চেয়ে বেশি গভীর হলে জল উঠছে না। অথচ কেন এমন হচ্ছে তার সন্তোষজনক উত্তর তিনি দিতে পারলেন না।

এই উত্তর খুঁজে বার করেন, তাঁরই ছাত্র তোরিচেলি। ইভান-জেলিস্তা তোরিচেলি (1608—1647) ছিলেন ইতালীয়। উনিশ বছর বয়সে ইনি রোমে এক অঙ্কের অধ্যাপকের কাছে পড়াশোনা করতে যান। গ্যালিলিওর লেখা একটি বই পড়ে তাঁর মনে আরো নানা বৈজ্ঞানিক চিন্তার উদয় হয়। তিনি নিজেও সেগুলি সম্বন্ধে একটি বই লেখেন, 1641 সালে ফ্লোরেন্সে তাঁর সঙ্গে গ্যালিলিওর দেখা হয়। তবে তার পরে গ্যালিলিও আর তিন মাস মাত্র বেঁচে ছিলেন, তোরিচেলি তখন ফ্লোরেন্সের এক্যাডেমিতে অঙ্কের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। আগে গ্যালিলিও এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 1643 সালে তোরিচেলি তাঁর সেই আবিষ্কারটি করেন যা তোরি-চেলির টিউব নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। এ ছাড়াও, তিনি টেলি-স্কোপের অনেক উন্নতি সাধন করেন ও একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করেন।

ডিউকের পাম্পে কেন জল উঠছিল না এই নিয়ে অনেক পরীক্ষা করেন তোরিচেলি। প্রথমে তিনি একটা খালি কাচের নল নিলেন যার একদিকের মুখ খোলা। নলে জল ভর্তি করে তিনি খালি মুখটি আঙুল দিয়ে চেপে নলটা উলটো করে একটা জলভর্তি প্লেটে দাঁড় করালেন। নলের মুখটা জলের মধ্যে পৌঁছে যাবার পর আঙুলটা সরিয়ে নিলেন। তোমরাও এই পরীক্ষাটা করে দেখতে পারো। দেখবে নলের জল প্লেটে পড়ছে না। এরকম হওয়ার কারণ কি ? তোরিচেলি ভেবে দেখলেন প্লেটের জলের উপর বাতাসের চাপ আছে বলেই নলের জল পড়তে পারছে না।

এর পরের প্রশ্ন হল, বাতাসের চাপ কতখানি জল এভাবে ধরে রাখতে পারে। আরো বড় বড় নল নিয়ে পরীক্ষা হল। কোন বারই নলের জল প্লেটে চলে এল না। কত বড় নল নিয়ে পরীক্ষা করবেন তিনি ? এ ক্ষেত্রে তোমরা হলে কি করতে ?

তোরিচেলি উপায় বার করলেন। জলের চেয়ে অনেক বেশি ভারি তরল পদার্থ নিয়ে যদি ঐ একই পরীক্ষা করা যায় তাহলে কত উচ্চতার নলে চলতে পারে? তিনি এক মিটার লম্বা নলে পারা ভর্তি করলেন। পারা জলের চেয়ে প্রায় সাড়ে তেরো গুণ ভারি।

পারা ভর্তি একটি প্লেটে আগের মত পারা ভর্তি নল উপুড় করলেন তোরিচেলি। এবার খানিকটা পারা প্লেটে চলে এল। মেপে দেখলেন নলে তখন প্রায় 76 cm পারা রয়েছে। তাহলে বোঝা গেল বাতাসের চাপ এই 76 cm পারদ দাঁড় করিয়ে রাখতে পারে। সাড়ে তেরো দিয়ে গুণ করে পাওয়া গেল জলের ওজন। অর্থাৎ 34 ফুট বা 10.37 মিটার জল বাতাসের চাপে উঠতে পারে—তার বেশি নয়। এইজন্যই টাসকানির সেই ডিউক মহাশয়ের পাম্পে জল উঠছিল না। তাঁর কুয়োর জল ছিল 40 ফুটের নিচে। এই সমস্যা এখনও আছে, যেখানেই গভীর নলকূপ আছে। গরম কালে জল নিচে নেমে গেলে তোলার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়।

তোরিচেলির এই পরীক্ষা থেকে আরো একটা জিনিস জানা গেল। জানা গেল বাতাসের চাপ মাপা যায়। কিভাবে? তোরিচেলি দেখলেন 30 ইঞ্চি নলের পারদ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে প্রায় 15 পাউণ্ড ওজন দিয়ে নিচের দিকে চাপ দিচ্ছে। বাতাসের চাপও ঠিক ততটাই হতে হবে। কারণ তা না হলে পারদের স্তম্ভ পড়ে যেত। এইভাবে বোঝা গেল প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে বাতাসের চাপ প্রায় 15 পাউণ্ড।

এর থেকে তোমাদের মনে আর একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে যদি 15 পাউণ্ড চাপ হয় তাহলে আমাদের শরীরের আয়তন হিসেব করে দেখ, কতখানি হাওয়ার চাপ আমাদের শরীরকে সহ্য করতে হচ্ছে। এই চাপে আমরা চ্যাপটা হয়ে যাচ্ছি না কেন?

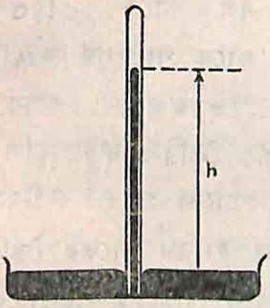
উত্তরটা ভেবে দেখ। সুবিধে হবে যদি বলে দিই চাঁদে হাওয়ার চাপ নেই কিন্তু তাই বলে সেখানে মহাকাশচারীদের খালি গায়ে

ঘুরে বেড়াবারও সাধ্য নেই। তাদের বিশাল ভারি বর্মের মত এক পোশাক পরে নিতে হচ্ছে। তাই বা কেন ?

পারদ ব্যারোমিটার

পাম্পের সাহায্যে জল 34 ফুট অথবা 10.37 মিটারের বেশি উচ্চতায় ওঠে না, এই ঘটনা তোরিচেলিকে বাতাসের চাপ মাপার উপায় বার করতে সাহায্য করেছিল। পারদ জলের চেয়ে প্রায় $13\frac{1}{2}$ গুণ ভারি। তিনি ভাবলেন বাতাসের চাপের জন্য পারদের উচ্চতা জলের উচ্চতার সাড়ে তেরো ভাগের এক ভাগ হওয়া উচিত। বাতাসের চাপ মাপার এই যন্ত্রকে **পারদ ব্যারোমিটার** বলে। বিবরণ নিচে দেওয়া হল।

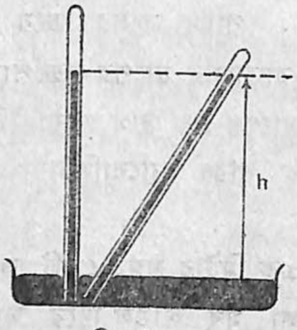
এক-মুখ-খোলা সমান ব্যাসযুক্ত এক মিটার লম্বা একটি কাচের নল নাও। পারদ ভর্তি করে খোলা মুখ আঙুল দিয়ে আটকে পারদপূর্ণ একটি পাত্রে উলটে রাখ। খোলা নলের মুখ থেকে আঙুল সরিয়ে নিলে দেখবে, পারদের স্তম্ভ অল্প নেমে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে (চিত্র 2.3)। পারদস্তম্ভের স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার কারণ বাইরের বায়ুমণ্ডলের চাপ পারদপূর্ণ পাত্রের উপর যে চাপ সৃষ্টি করেছে সেই চাপ পারদের স্তম্ভকে ধরে রেখেছে। কাচের নলের উপরের অংশ, যেখানে পারদ নেই, সেই স্থান শূন্য, অর্থাৎ সেখানে কোন কিছুই নেই। খুব অল্প পরিমাণে কিছু পারদের বাষ্প সেখানে আছে। এই শূন্য স্থানকে **তোরিচেলির শূন্যস্থান** বা ইংরেজীতে তোরিচেলিজ ভ্যাকুয়াম বলে। স্বাভাবিক অবস্থায় বায়ুমণ্ডলের চাপ 76 cm পারদের চাপের সমান, জলের ব্যারোমিটারের উচ্চতা হবে 76×13.5 cm বা 10.37 মিটার বা 34 ফুট। বায়ুমণ্ডলে তাপের



চিত্র **2.3**

পরিবর্তন হলে চাপেরও পরিবর্তন হয়। বাতাসে বেশি পরিমাণে জলীয় বাষ্প জমা হলেও চাপ কমে, কারণ জলীয় বাষ্প বাতাসের চেয়ে হালকা।

বিভিন্ন ব্যাসের নল নিলেও পারদের উচ্চতা সমান থাকবে। আবার নলের মুখ পারদ পাত্রে ডুবিয়ে নলটিকে বাঁকিয়ে যে কোন অবস্থাতে রাখ না কেন পারদের উচ্চতা সমান থাকবে (চিত্র 2.4)।

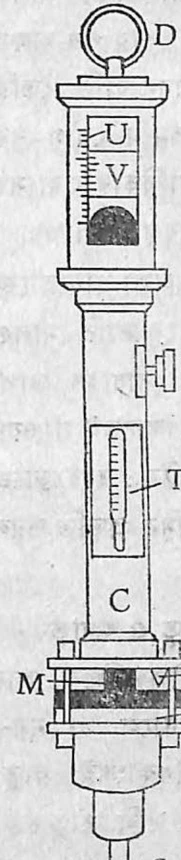


চিত্র 2.4

উপরের ব্যারোমিটারে বায়ুমণ্ডলের চাপ নির্ভুলভাবে মাপা যায় না। নির্ভুলভাবে চাপ মাপবার ব্যারোমিটারের নাম **ফর্টিনস ব্যারোমিটার** (চিত্র 2.5)।

ফর্টিনস ব্যারোমিটারে প্রায় এক মিটার লম্বা একটা একমুখ কাচের নল আছে। বিশুদ্ধ পারদে ভর্তি করে নলটি উলটিয়ে রাখা থাকে পারদপূর্ণ আধার Rএ। কাচনলটি ধাতুনির্মিত একটা নলের ভিতর রাখা থাকে। আধার Rএর নিচের অংশ শ্যাময় চামড়ায় তৈরি একটা থলি। এই থলিটি স্ক্রু Sএর সাহায্যে ওঠানামা করানো হয়। ফর্টিনস ব্যারোমিটারে উচ্চতা মাপক স্কেলের শূন্য হাতির দাঁতের তৈরি সূচক Iএর ডগা। স্ক্রু S ওঠানামা করিয়ে পারদের পৃষ্ঠতলকে I সূচকের ডগার সংস্পর্শে আনতে হয়। ধাতুনির্মিত নলের উপর অংশ খাড়াভাবে কাটা যাতে কাচ-নলের ভিতরের পারদের উচ্চতা দেখা যায়। ধাতুনলে একটা স্কেল U অংশাঙ্কিত আছে এবং সূক্ষ্মভাবে পারদের উচ্চতা মাপার জন্য ভার্নিয়ার V আছে। যখন বায়ুমণ্ডলের চাপ মাপা হয় তখন স্ক্রু S প্রয়োজনমত ওঠানামা করিয়ে আধারে রক্ষিত পারদের পৃষ্ঠতল সূচক I এর ডগার সংস্পর্শে আনতে হয়। পরে ভার্নিয়ার V পারদতলের সঙ্গে স্পর্শকের মত রেখে স্কেল ও ভার্নিয়ারের পাঠ নিয়ে উচ্চতা মাপা হয়। এই

উচ্চতাই বায়ুমণ্ডলের চাপ। চাপের সূক্ষ্ম পরিবর্তন মাপার জন্য জল বা গ্লিসারিন ব্যারোমিটার আবহাওয়া অফিসে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, কারণ এদের উচ্চতা পারদের চেয়ে অনেক বেশি। অ্যানিরয়েড ব্যারোমিটারে তরল ব্যবহার করা হয় না। আবহাওয়ার পূর্বাভাস চাপের পরিবর্তন থেকে করা সম্ভব। আজকাল কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে আবহাওয়া আগে থেকে জানা সম্ভব হয়েছে।



চিত্র 2.5

প্রশ্ন: গ্লিসারিন জলের থেকে 1.26 গুণ ভারি। গ্লিসারিন ব্যারোমিটারের উচ্চতা কত?

মৌল ও যৌগ

জলের ক্ষুদ্রতম অংশ তার অণু। এই অণুকে ভাঙলে দুটি হাইড্রোজেন ও একটি অক্সিজেন পরমাণু পাওয়া যাবে। তেমনি চিনির একটি অণুকে ভাঙলে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণু পাবে। তোমরা তাহলে দু'ধরনের বস্তু পাচ্ছ। এক রকম বস্তুর অণুগুলো একই জাতের পরমাণু দিয়ে তৈরি। এদের বলে **মৌলিক বস্তু** অথবা **মৌল**। আর এক ধরনের বস্তু একাধিক জাতের পরমাণু দিয়ে তৈরি। এদের বলে **যৌগিক বস্তু বা যৌগ**। জল, চিনি প্রভৃতি যৌগ। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন ইত্যাদি মৌল পদার্থ অণু যৌগের ক্ষুদ্রতম অংশ। এজন্য অণুতে যৌগের সমস্ত ভৌত ও রাসায়নিক গুণ বর্তমান। যেমন জলের অণুতে জলের সমস্ত গুণ পাওয়া যাবে। যৌগের অণুকে ভাঙা হলে

উপাদানগুলি পরমাণুতে পরিণত হবে। তখন যৌগের কোন গুণ আর থাকবে না।

পর পর অক্ষর সাজিয়ে যেমন শব্দ তৈরি হয় বা ইট সাজিয়ে যেমন বাড়ি তৈরি হয়, মৌল উপাদানের পরমাণুগুলো যুক্ত হয়ে তেমনি যৌগ বস্তু তৈরি হয়। আজ পর্যন্ত প্রায় 105টি মৌল আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। তার মধ্যে 92টি মৌল প্রাকৃতিক অবস্থায় পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক মৌলগুলির মধ্যে সবচেয়ে হালকা হাইড্রোজেন ও সবচেয়ে ভারি ইউরেনিয়ম। ইউরেনিয়মের চেয়ে ভারি মৌলগুলি গবেষণাগারে তৈরি করা হয়েছে।

সাধারণ তাপমাত্রায় মৌলগুলি কঠিন, তরল ও গ্যাস তিন অবস্থাতেই পাওয়া যায়। সোনা, লোহা, সীসা, তামা প্রভৃতি মৌল কঠিন ; হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নিয়ন প্রভৃতি গ্যাস এবং পারদ, ব্রমিন প্রভৃতি তরল।

ধাতু ও অধাতু

মৌলগুলিকে আবার ধর্ম অনুযায়ী ধাতু এবং অধাতু, ইংরেজীতে মেটালে ও নন-মেটালে ভাগ করা হয়েছে। 92টি মৌলের অধিকাংশই ধাতু। লোহা, তামা, দস্তা, টিন, সোনা, রুপো, এইগুলি ধাতু। আবার কার্বন, গন্ধক, অক্সিজেন প্রভৃতি অধাতু। তরলের মধ্যে পারদ ধাতু। পারদ ছাড়া সমস্ত ধাতুই কঠিন। কিন্তু অধাতু স্বাভাবিক অবস্থায় কঠিন, তরল ও গ্যাস তিন অবস্থাতেই থাকে। ধাতু পালিশ করলে চকচকে দেখায়। অধাতু সকল অবস্থাতেই ঔজ্জ্বল্যহীন। ধাতুকে পিটিয়ে পাত করা যায়। অধাতুকে পিটিয়ে পাত করা সম্ভব নয়।

যৌগ ও মিশ্রণ

যে কোন দুটি বা তার চেয়ে বেশি বস্তু মেশালেই কিন্তু যৌগ তৈরি নাও হতে পারে। যৌগের উপাদানগুলি একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে

পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন জল একটি যৌগ এবং এর উপাদান হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। দুই ভাগ হাইড্রোজেন এক ভাগ অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হয়ে জল তৈরি করে। প্রতিটি যৌগের উপাদানগুলি নির্দিষ্ট অনুপাতে মিলিত হয়। দুই বা ততোধিক মৌল বা যৌগ যে কোন অনুপাতে মিশে যে বস্তু তৈরি করে তাকে বলে **মিশ্রণ**। যেমন চিনি ও বালির মিশ্রণ। যৌগে মূল উপাদানগুলির গুণ বর্তমান থাকে না, কিন্তু মিশ্রণে মূল উপাদানগুলির গুণ বর্তমান থাকে। জলে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের ধর্ম থাকে না। জলের ধর্ম এই দুটি গ্যাসের ধর্ম থেকে পৃথক। চিনি ও বালির মিশ্রণে উপাদান দুটির ধর্ম বজায় থাকে, চিনি ও বালিকে সহজেই পৃথক করতে পারবে। জলে এই মিশ্রণ মেশালে চিনি জলে গুলে যাবে ও নিচে বালি পড়ে থাকবে। পরে জল ফুটিয়ে চিনিকে আলাদা করতে পার। জল বাষ্প হয়ে উবে গেলে নিচে চিনি পড়ে থাকবে। কিন্তু রাসায়নিক প্রক্রিয়া ছাড়া যৌগের মূল উপাদানগুলি পৃথক করা সম্ভব নয়। গন্ধক ও লোহার গুঁড়ো মেশালে চুম্বকের সাহায্যে লোহার গুঁড়ো আলাদা করে নিতে পারা যায়। গন্ধক ও লোহার গুঁড়োর মিশ্রণকে যদি গরম কর তবে দুটি বস্তু মিলে একটি কালো রঙের বস্তু পাবে। এখন আর চুম্বকের সাহায্যে লোহার গুঁড়ো আলাদা করা সম্ভব নয়। এই কালো রঙের বস্তুকে বলে ফেরাস সালফাইড। এটি একটি যৌগ। এর ধর্ম গন্ধক ও লোহার গুঁড়োর ধর্ম থেকে আলাদা।

সহজ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া

দুই বা তার চেয়ে বেশি বস্তুর **মিশ্রণ** থেকে উপাদানগুলি পৃথক করার প্রায়ই প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে বস্তুর শুদ্ধীকরণ বা পিউরিফিকেশনে এটা অপরিহার্য। যখন দুটো কঠিন বস্তুর মিশ্রণে বস্তু দুটিকে তাদের রং বা অন্য কোন গুণের জন্য চেনা যায় তখন

তাদের হাত দিয়ে বেছে আলাদা করা যেতে পারে। চাল থেকে কাঁকর এইভাবে বাছা হয়। চুম্বকের সাহায্যে লোহার গুঁড়ো ও গন্ধকের মিশ্রণকে পৃথক করা যায়। গবেষণাগারে যে সব প্রক্রিয়ার সাহায্যে দুই বা ততোধিক বস্তুর মিশ্রণকে পৃথক করা হয় সেগুলি নিচে দেওয়া হল।

অবক্ষেপণ

ধুলো, বালি, কাঁকর প্রভৃতি যে সব বস্তু জলে গুলে যায় না, সেই সব বস্তুর জলে মিশ্রণকে কিছুক্ষণ রেখে দিলে নিজেদের ওজনে কণাগুলি ধীরে ধীরে নিচে জমা হতে থাকে। এই প্রক্রিয়াকে **অবক্ষেপণ** বা **সেডিমেণ্টেশন** বলে। জলের নিচে থিতিয়ে পড়া বস্তুকে বলে **তলানি** বা সেডিমেণ্ট। নদীর ঘোলা জলকে একটা বীকারে নিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিলে ধুলো বালি নিচে গিয়ে জমা হয়।

আস্রাবণ

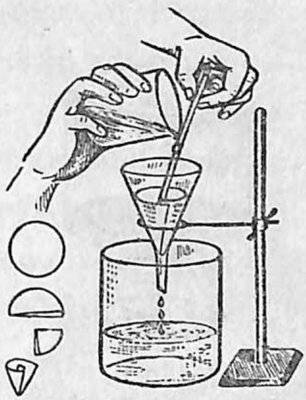
অবক্ষেপণ পদ্ধতিতে জলের ধুলো বালি নিচে জমা হলে উপরের পরিষ্কার জলকে বীকারটি সাবধানে কাৎ করে ঢেলে নেওয়া সম্ভব। এই প্রক্রিয়াকে **আস্রাবন বা ডিক্যাণ্টেশন** বলে।

পরিস্রাবণ

কণাগুলি যদি খুব সূক্ষ্ম হয় তবে অবক্ষেপণ পদ্ধতিতে সেগুলির অপসারণ সম্ভব হয় না। খড়িমাটির কণা জলে ছড়িয়ে দিলে দেখবে খড়িমাটির সূক্ষ্ম কণাগুলি নিচে থিতিয়ে না পড়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। এই ধরনের মিশ্রণ থেকে কণাগুলি ছেঁকে পৃথক করতে হয়। সাধারণত ফিলটার কাগজ, কাপড়ের টুকরো, কাঠকয়লার গুঁড়ো, তুলো প্রভৃতির সাহায্যে ছেঁকে সূক্ষ্ম কণা পৃথক করতে হয়। এই পদ্ধতিকে বলে **পরিস্রাবণ** বা ফিলট্রেশন। ফিলটার

কাগজে যে কঠিন বস্তু পড়ে থাকে তাকে বলে **পরিস্রুত** বা ফিলট্রেট।

ফিলটার কাগজটিকে 2.6 ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেইভাবে চার ভাঁজ করে কুপী বা ফানেলের মুখে বসানো হয়। তারপর ঘোলা জল একটা কাচের দণ্ডের সাহায্যে কাগজে ঢেলে দিতে হয়। কঠিন বস্তুটি কাগজে আটকে যাবে ও জল নিচের পাত্রে জমা হবে।



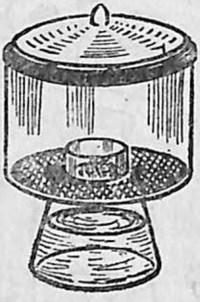
চিত্র 2.6

বাষ্পীভবন

কোন পদার্থের জলীয় দ্রবণকে গরম করে জল দূর করতে হয়। জলীয় অংশ বাষ্পে পরিণত হওয়াকে বলে **বাষ্পীভবন** বা ভেপোরাইজেশন। বাষ্পীভবন দুই রকমের—**বাষ্পায়ণ** বা ইভ্যাপোরেশন এবং **স্ফুটন** বা বয়লিং। কোন তরল পদার্থ থালায় রেখে দিলে অনেকক্ষণ পরে দেখবে থালার জল শুকিয়ে গিয়েছে এবং তরলের মিশ্রিত কঠিন বস্তু থালায় পড়ে আছে। সাধারণ তাপমাত্রায় এই জল বাষ্প হয়ে বাতাসের সঙ্গে মিশে যায়। এই পদ্ধতিকে বলে বাষ্পায়ণ। বাষ্পায়ণ পদ্ধতিতে তরলের উপর পৃষ্ঠদেশ থেকে তরল বাষ্পে পরিণত হয়। কিছু কিছু তরল অতি দ্রুত বাষ্পায়িত হয়—যেমন পেট্রল, ইথার, স্পিরিট, অ্যালকোহল। এগুলিকে **উদ্বায়ী** বা ভলাটাইল তরল বলে। স্ফুটন পদ্ধতিতে তরলকে গরম করতে থাকলে একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় তরলের সকল অংশ থেকে দ্রুত বাষ্প উঠতে থাকে। তরলের গায়ে বুদ্বুদ দেখা যায় ও একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়। একটা পাত্রে কিছু চিনি গোলা জল নিয়ে ফোটাতে থাক। কিছুক্ষণ পরে দেখবে তরলের জল বাষ্প হয়ে বেরিয়ে গেছে ও চিনি নিচে পড়ে আছে।

শুষ্কীকরণ

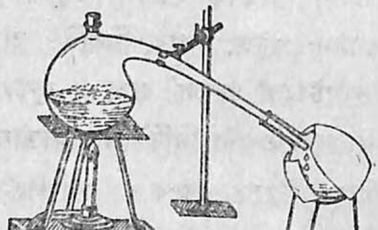
কোন কঠিন পদার্থে জলীয় কণা থাকলে গরম করে জলীয় কণা দূর করতে হয়। এই পদ্ধতিকে বলে **শুষ্কীকরণ** বা ড্রাইং বা ডেসিকেশন। সাধারণত কাচের পুরু দেয়াল বিশিষ্ট পাত্রে নমুনা বস্তু রেখে শুষ্কীকরণ ঘটাতে হয় (চিত্র 2·7)। এই পাত্রকে বলে **শোষকাধার** বা ডেসিকেটর। পাত্রটির কাচের একটি ভারি ঢাকনা আছে। কাচের পাত্রের নিচের অংশ সরু। ছবি দেখলে বুঝতে পারবে। নিচের অংশে নমুনা বস্তুর জল শোষণ করার জন্য গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড বা নিরুদক ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড রাখা হয়। উভয় অংশের মাঝখানে সরু ছিদ্র বিশিষ্ট দস্তার একটি প্লেট রাখা আছে। এই প্লেটের উপর নমুনা বস্তু রাখা হয়। নমুনা বস্তুকে ভিতরে রাখলে জলের কণা বাষ্পায়িত হয় ও বস্তুটি তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়।



চিত্র 2.7

পাতন

উপরের পদ্ধতিগুলোর সাহায্যে জলীয় অংশ দূর করলে জল বাষ্প হয়ে চলে যায় ও কঠিন বস্তু নিচে পড়ে থাকে। জল ফিরে পাওয়া যায় না। জলীয় মিশ্রণকে গরম করে পরে বাষ্পকে ঠাণ্ডা করে আবার জল ফিরে পাওয়ার পদ্ধতিকে **পাতন** বা ডিস্টিলেশন বলে। পাতন পদ্ধতিতে দ্রাব ও দ্রাবক উভয়কেই পৃথকভাবে পাওয়া সম্ভব। যে যন্ত্রের সাহায্যে জলীয় মিশ্রণকে পাতিত করা হয়



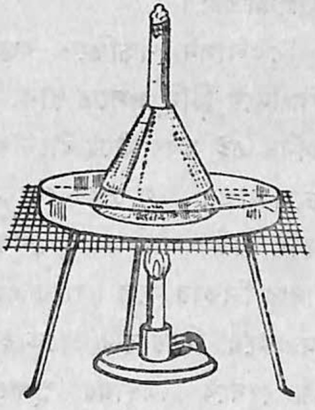
চিত্র 2.8

তাকে বলে **বকযন্ত্র**। একটা বকযন্ত্রে জলীয় মিশ্রণ রেখে বকযন্ত্রের লম্বা গলাটা একটা ফ্লাস্কের ভিতর ঢুকিয়ে রাখ (চিত্র 2.8)। ফ্লাস্কের গায়ে জলের ধারা দেবার ব্যবস্থা করা হয় অথবা ভিজে ন্যাকড়া জড়িয়ে রাখা হয় যাতে বাষ্প আবার তরলে পরিণত হয়। বকযন্ত্রটি তারের জালির উপর রেখে বুনসেন দীপের সাহায্যে ফোটাতে থাকলে বাষ্প ফ্লাস্কের ভিতরে এসে তরলে পরিণত হবে। এই জল বিশুদ্ধ। একে **পাতিত জল** বা ডিস্টিল্ড ওয়াটার বলে। পাতন সম্পূর্ণ হলে দ্রাব ও দ্রাবক সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে পাওয়া যায়। ওষুধে ও গবেষণাগারে পাতিত জল ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ঊর্ধ্বপাতন

কোন কোন কঠিন বস্তু গরম করলে তরলে পরিণত না হয়ে সোজা গ্যাসে পরিণত হয়। আবার বাষ্পকে ঠাণ্ডা করলে তরল না হয়ে কঠিন বস্তুতে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়াকে **ঊর্ধ্বপাতন** বা সাবলিমেশন বলে। কর্পূর, ন্যাপথালিন, অ্যামোনিয়ম ক্লোরাইড, আয়োডিন প্রভৃতি বস্তু কঠিন অবস্থা থেকে সোজা গ্যাসে পরিণত হয়। যে সব বস্তু স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ধীরে ধীরে বাষ্পে পরিণত হয় তাদের **উদ্বায়ী বস্তু** বা ভলাটাইল সাবস্টান্স বলে। উদ্বায়ী ও **অনুদ্বায়ী** বস্তুকে ঊর্ধ্বপাতনের সাহায্যে পৃথক করা যায়।

একটা কাচের পাত্রে আয়োডিন ও বালি নাও (চিত্র 2.9)। ছবির সঙ্গে মিলিয়ে পাত্রের উপর একটা ফানেল উলটো করে বসিয়ে ফানেলের নলের মুখ তুলো দিয়ে বন্ধ কর। একটা ভিজে ব্লটিং কাগজ ফানেলের উপর বসাও। ফানেল সমেত পাত্রটিকে একটা

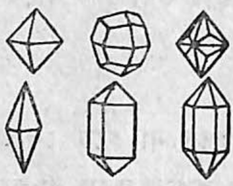


চিত্র 2.9

তারের জালির উপর বসিয়ে অল্প গরম করতে থাকলে দেখবে আয়োডিনের বেগুনি বাষ্প উপরে উঠছে ও ফানেলের গায়ে জমা হচ্ছে, এইভাবে সমস্ত আয়োডিন বাষ্পীভূত হয়ে বালি নিচে পড়ে থাকবে।

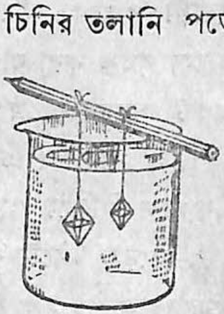
কেলাসন

অধিকাংশ কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট জ্যামিতিক আকার আছে। খাবার লবণের আকার ঘনকের মত, ফটকিরির ডবল পিরামিডের মত, চিনির আয়তাকার ও গন্ধকের লম্বাটে। এই আকার ছোট বড় সব অবস্থায় একই রকম থাকে। জ্যামিতিক আকার বিশিষ্ট কঠিন পদার্থের টুকরোগুলোকে বলে **কেলাস** বা ক্রুস্টাল। কয়েক ধরনের কেলাস 2.10 ছবিতে দেখান হল। যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে কেলাস তৈরি করা হয় তাকে বলে **কেলাসন** বা ক্রুস্টালাইজেশন। আবার সংখ্যায় অল্প হলেও কয়েকটি বস্তু আছে যাদের কোন নিয়মিত জ্যামিতিক আকার নেই। এদের বলে **অকেলাস** বা নন-ক্রুস্টাল। উদাহরণ কাচ, পিচ, আলকাতরা।



চিত্র 2.10

কেলাসন পদ্ধতিতে বস্তুকে পৃথক করা যায়। একটা বীকারে জল নিয়ে চিনি গুলতে থাক, যতক্ষণ না নিচে চিনির তলানি পড়ে। চিনির এই দ্রবণ ধীরে ধীরে অন্য পাত্রে ঢেলে নাও। যে দ্রবণ থেকে কেলাস তৈরি করা যায় তাকে **শেষ দ্রব** বা মাদার লিকার বলে। পরে এই দ্রবণকে ঘন করে নিয়ে যদি তাকে হঠাৎ ঠাণ্ডা কর দেখবে মিছরির সুন্দর কেলাস পাবে। কেলাসের বড় দানা তৈরি করার জন্যে শেষ দ্রবে মিছরির দানা সুতো দিয়ে ঝুলিয়ে ধীরে



চিত্র 2.11

ধীরে ঠাণ্ডা হতে দিতে হয় (চিত্র 2.11)। এভাবে বড় বড় আকারের কেলাস পাওয়া যায়। গন্ধককে কোন পাত্রে তাপ দিয়ে গালিয়ে ঠাণ্ডা হতে দিলে সূচের মত লম্বা কেলাস দেখতে পাওয়া যায়।

প্রশ্ন

1. বাতাস কি কি উপাদানের মিশ্রণ ?

2. বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে যা যা জান লেখ। বায়ুমণ্ডলের চাপ বলতে কি বোঝ ? বায়ুমণ্ডলের চাপ কি ভাবে মাপা হয় ? যন্ত্রটির নাম কি ?

3. বাতাসের কি ওজন আছে ? কি ভাবে ওজন মাপা হয় ?

4. মৌল ও যৌগ কাকে বলে ? উদাহরণ সহ বোঝাও। যৌগ ও মিশ্রণ, ধাতু ও অধাতুর মধ্যে পার্থক্য কি ?

5. টীকা লেখ :

সালোকসংশ্লেষ, ক্ষোভমণ্ডল, সমতাপমণ্ডল, আয়নমণ্ডল।

6. বিভিন্ন মৌলের বা যৌগের মিশ্রণকে গবেষণাগারে যে সব পদ্ধতিতে পৃথক করা হয় সেগুলি সম্বন্ধে যা জান লেখ।

7. সাইকেলের পাম্পের মুখ আঙুল দিয়ে চেপে হাতলটা ভিতর দিকে ঠেলে দেওয়া হল। 'বাড়বে' 'কমবে' অথবা 'একই থাকবে' এই তিনটি কথার সাহায্যে নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

(ক) আবদ্ধ বাতাসের আয়তন—

(খ) আবদ্ধ বাতাসে অণু, পরমাণুর সংখ্যা—

(গ) আবদ্ধ বাতাসের ওজন—

(ঘ) আবদ্ধ বাতাসের চাপ—

(ঙ) পাশাপাশি অণু পরমাণুদের মধ্যে দূরত্ব—

8. একটা খালি শিশি কি সত্যিই খালি ?

9. দুটো বস্তুকে মিশিয়ে দেখা গেল তাদের সহজেই পৃথক করা সম্ভব এবং মিশ্রণেও তাদের আলাদা ভাবে চেনা সম্ভব। তাদের মিশ্রণকে কি বলা হয় :

(ক) যান্ত্রিক মিশ্রণ ?

(খ) রাসায়নিক যৌগ ?

10. নিচের কোন ক্ষেত্রে আবদ্ধ বাতাসের চাপ বায়ুমণ্ডলের চাপের চেয়ে বেশি ?

(ক) মোটর গাড়ির টিউবে

(খ) বাতাসের টিউবে

(গ) সাইকেলের টিউবে

(ঘ) খোলা কফির টিনের ভেতরে

11. নিচে কখন বাতাসের চাপ বাড়বে এবং কখন কমবে ?

(ক) পাহাড়ে ওঠার সময়

(খ) গভীর খনির নিচে গেলে

(গ) সমুদ্রের তলদেশে গিয়ে পৌঁছলে

12. সমুদ্রের প্রায় তলদেশে বাস করে এমন কোন মাছকে ভূপৃষ্ঠে আনলে কি হবে ?

13. আগুন নেভাতে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ব্যবহার করা হয় কেন ?

14. ভুল শব্দটি কেটে দাও :

(ক) উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে তাপমাত্রা বাড়ে/কমে।

(খ) বর্তমান শতাব্দীতে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে/কমছে।

(গ) বায়ুপ্রবাহ বা ঝড় দেখা যায় না সমতাপমণ্ডলে/ক্ষোভমণ্ডলে।

(ঘ) ভূপৃষ্ঠের উপর বায়ুমণ্ডলের চাপ সবচেয়ে বেশি/কম।

(ঙ) একটা অণুকে ভাঙা যায়/যায় না।

(চ) চিনি যৌগ/মৌল।

(ছ) বাতাসের ওজন প্রথম মাপেন তোরিচেলি/অটো ফন গেরিক।

15. পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল আছে, চাঁদের নেই। বায়ুমণ্ডল থাকার সুবিধা কি ?

16. শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

(ক) যে বস্তুর অণু একই ধরনের — দিয়ে তৈরি তাদের — বস্তু বলে।

(খ) যে বস্তুর অণু বিভিন্ন ধরনের — দিয়ে তৈরি তাদের — বস্তু বলে।

(গ) যৌগ তৈরি একাধিক বস্তুর —।

(ঘ) অ্যামোনিয়ম ক্লোরাইডকে উত্তপ্ত করলে — হয়।

17. নিচের কোনটি কঠিন, তরল অথবা গ্যাস ?

(ক) লোহাগুঁড়ো, (খ) জল, (গ) চকগুঁড়ো, (ঘ) পেট্রল, (ঙ) অক্সিজেন

18. নিচের কোনটি মিশ্রণ, দ্রবণ, যৌগ অথবা মৌল ?

(ক) চিনি, (খ) চুন, (গ) বরফ, (ঘ) চিনির সরবত, (ঙ) কংক্রিট, (চ) লোহাগুঁড়ো, (ছ) অক্সিজেন, (জ) কার্বন ডাইঅক্সাইড, (ঝ) সোনা, (ঞ) কাঁকরমেশা চাল, (ত) সোডা জল।

19. নিচের কোনটি ধাতু বা অধাতু ?

(ক) পারদ, (খ) টিন, (গ) লোহা, (ঘ) সোনা, (ঙ) কার্বন, (চ) অক্সিজেন, (ছ) রুপো, (জ) গন্ধক।

20. যৌগ ও মিশ্রণে পার্থক্য কি ? বাতাস যৌগ না মিশ্র ?

21. বাঁদিকের বাক্যাংশের সঙ্গে ডানদিকের বাক্যাংশ মিলিয়ে অর্থবোধক বাক্য গঠন কর :

(ক) জলে লবণ ঢেলে নাড়তে থাকলে	(i) যৌগ হবে
(খ) গন্ধকের গুঁড়োয় লোহাগুঁড়ো মেশালে	(ii) মিশ্রণ হবে
(গ) গন্ধক ও লোহাগুঁড়ো মিশিয়ে গরম করলে	(iii) মিশ্রণ হবে
(ঘ) জলে চুন ঢাললে	(iv) যৌগ হবে
(ঙ) চিনিতে বালি মেশালে	(v) মিশ্রণ হবে

22. নিচের কোন বাক্যটি ঠিক, কোনটি ভুল :

(ক) জল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিশ্রণ।

(খ) বাতাসে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকায় প্রমাণিত হয় বাতাস একটি যৌগ।

(গ) সমুদ্রের জল বিভিন্ন বস্তুর মিশ্রণ।

(ঘ) বাতাসের ভর ও ভার আছে।

23. বাক্য সম্পূর্ণ কর :

(ক) যৌগের ক্ষুদ্রতম অংশকে বলে—

(খ) মৌলের ক্ষুদ্রতম অংশকে বলে—

(গ) কেলাস তৈরির পদ্ধতিকে বলে—

(ঘ) জলের নিচে থিতিয়ে পড়া বস্তুকে বলে—

(ঙ) ঘোলা জলকে পরিষ্কার করার পদ্ধতিকে বলে—

(চ) ফিলটার কাগজের সাহায্যে জল পরিষ্কার করার পদ্ধতিকে বলে—

(ছ) যে সব বস্তু দ্রুত বাষ্পীভূত হয় তাদের বলে—

(জ) জলে দ্রবীভূত বস্তুকে পৃথক করার পদ্ধতিকে বলে—

(ঝ) জ্যামিতিক আকারযুক্ত পদার্থের টুকরোকে বলে—

(ঞ) যে প্রক্রিয়ায় কঠিন বস্তু গরম করলে সোজা বাষ্পে পরিণত হয় তাকে বলে—

(ত) যে দ্রবণ থেকে কেলাস তৈরি করা হয় তাকে বলে—

24. কাকে বলে ? (৩।৪ লাইনে উত্তর দাও)

(ক) বাতাসের চাপ

(খ) টোরিচেলির শূন্যস্থান

(গ) পারদ ব্যারোমিটার

25. বলো কেন। (৩।৪ লাইনে উত্তর দাও)

(ক) এক মিটার লম্বা কাচের নল পারদ ভর্তি করে পারদের পাত্রে উলটিয়ে রাখলে পারদের স্তম্ভ একেবারে পড়ে যায় না।

(খ) গেলাসে কানায় কানায় জল নিয়ে একটা পোস্টকার্ড তার উপরে রেখে গেলাস ভর্তি জল উলটিয়ে ধরলে জল পড়ে না।

(গ) পেট্রোলের একটা খালি টিনে অল্প জল নিয়ে গরম করার পর বাষ্প বেরিয়ে গেলে ছিপি আটকিয়ে টিনের বাইরের গায়ে জল ঢাললে টিনটা তুবড়ে যায়।

(ঘ) মহাকাশচারীরা চাঁদের বুকে বর্ম পরে ঘুরে বেড়ায়।

26. সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :

অবক্ষেপণ, পরিস্রাবণ, আস্রাবণ, বাষ্পীভবন, স্ফুটন, বাষ্পায়ন, শুষ্কীকরণ, পাতন, ঊর্ধ্বপাতন, কেলাসন, কেলাস, সালোকসংশ্লেষ, ক্ষোভমণ্ডল, সমতাপমণ্ডল, আয়নমণ্ডল, বায়ুদূষিত।

———

৩ জল

জল কি করে তৈরি হল ?

বহুদিন আগে যখন পৃথিবী সৃষ্টি হল তখন হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন এই দুটি গ্যাস মিলে তৈরি হল জল, সেই জল দিয়ে পৃথিবীর প্রায় চার ভাগের তিন ভাগ ভর্তি হয়ে গেল।

সৃষ্টির সেই গোড়ার দিকে যে জল তৈরি হয়েছিল তারপরে কিন্তু জলের পরিমাণ আর বাড়ে নি, বৃষ্টির জল নতুন করে তৈরি জল নয়। নদী, নালা, খাল, বিল, সমুদ্র, এমনকি ভিজে জামাকাপড় ইত্যাদি থেকে জল গরমে ক্রমাগত শুকিয়ে বাষ্পের আকারে আকাশে উঠছে। ক্রমে মেঘ হচ্ছে এবং মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়ে সেই মাটির জল আবার মাটিতেই ফিরে আসছে।

তরলের কয়েকটি ধর্ম

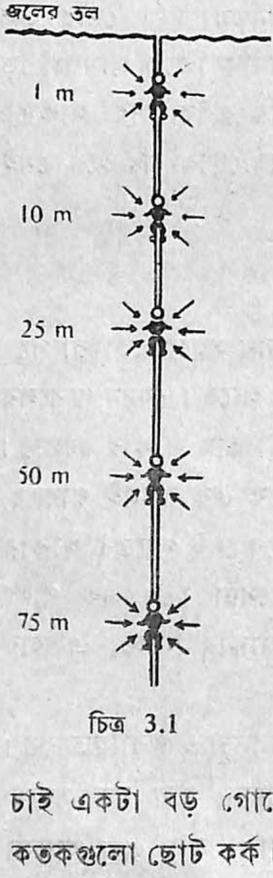
জল একটি তরল পদার্থ। কঠিন ও তরল পদার্থ সম্বন্ধে তোমরা পরে আরো পড়বে। তরলের কয়েকটি বিশেষ ধর্ম আছে। যেমন, তরলের নিজস্ব কোন আকার নেই। আধার অনুযায়ী তার আকার বদলায়। কঠিন পদার্থের আকার যে পাত্রেই রাখা হোক এক রকমই থাকবে, কিন্তু তরল পদার্থকে যখন যেখানে রাখা হবে সেই পাত্রের আকার নেবে। এক গেলাস জল থালায় ঢাললে সেটা হবে এক থালা জল। অর্থাৎ সেই জল একবার গেলাসের আকার নিচ্ছে, একবার থালার।

তরলের আর একটি ধর্ম তরল উঁচু থেকে নিচুতে প্রবাহিত হয়। তবে তরলের মধ্যেও রকমফের আছে, যেমন জল যত সহজে গড়ায়, তত সহজে আলকাতরা গড়ায় না। জল এবং পাতলা

গুড় অথবা মধু নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পার। একটি বড় চ্যাপটা পাত্র কাত করলে তার একদিক থেকে অন্যদিকে যেতে কোনটার কত সময় লাগছে? জল গড়াতে পারে বলেই নদী উৎস থেকে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়, কল থেকে জল পড়ে, বৃষ্টির জল গড়িয়ে নালি বেয়ে চলে যায়। জল যদি গুড়ের মত ঘন হত তাহলে আমাদের কি কি অসুবিধে হত বলতে পার?

তরলের চাপ—পার্শ্ব, নিম্ন ও ঊর্ধ্ব চাপ

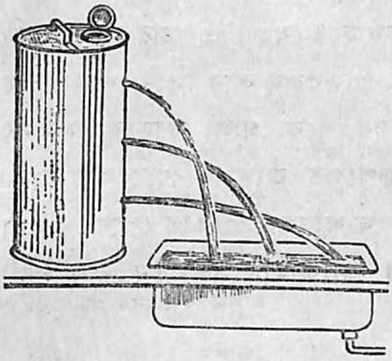
পদার্থের একটি ধর্ম হল ওজন ও চাপ দেওয়া; সেকথা তোমরা বাতাস সম্বন্ধে পড়বার সময় জেনেছ। জল যখন পদার্থ তখন তারও ওজন আছে এবং চাপ দেবার ক্ষমতা আছে। কঠিন পদার্থ কেবল নিচের দিকেই চাপ দেয়, তরল পদার্থ নিচে, উপরে ও পাশে চাপ দিতে পারে। সাবমেরিন জলের যত নিচে যায় তার উপর চাপ তত বাড়তে থাকে। জলে 1 cm নিচে 1 cm^2 ক্ষেত্রফলের উপর চাপ হবে এক গ্রাম কারণ 1 cc জলের ওজন এক গ্রাম। সেইরকম 1 m নিচে চাপ হবে 100 g। তাহলে সমুদ্রপৃষ্ঠের তলায় প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে চাপ কত সেটা পাশের ছবি থেকে হিসাব কর (চিত্র 3.1)।



চিত্র 3.1

গভীরতার সঙ্গে চাপের সম্পর্ক আরো ভালো করে বোঝবার জন্য একটা পরীক্ষা করে দেখ। এর জন্য চাই একটা বড় গোছের টিন বা ড্রাম, পেরেক, হাতুড়ি, আর কতকগুলো ছোট কর্ক।

পেরেক আর হাতুড়ি দিয়ে টিনের গায়ে কতকগুলো গর্ত কর—উপরে, মাঝখানে ও নিচের দিকে। প্রত্যেকটা গর্ত কর্ক দিয়ে আটকে রাখ। টিনে জল ভর্তি কর। এবার সবচেয়ে তলায় গর্তের ছিপি খুলে দাও। মেপে দেখ জলটা কত দূর গিয়ে পড়ছে। এবার এই গর্তের ছিপি বন্ধ করে আবার জল ভর্তি কর। দু নম্বর গর্তের ছিপি খুলে মেপে দেখ জলটা কত দূরে যাচ্ছে। এবার এটা বন্ধ করে সবচেয়ে ওপরের গর্তের ছিপি খোল। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সবচেয়ে নিচে জলের চাপ বেশি বলে জলটা চাপে সবচেয়ে দূরে গিয়ে পড়ছে। একসঙ্গে যদি তিনটি কর্ক খুলে দাও তিনটি জলের ধারা থেকে চাপের পার্থক্য পরিষ্কার বুঝতে পারবে (চিত্র 3.2)।



চিত্র 3.2

যদি পাত্রের তলায় ফুটো কর, তবে জল নিচের দিকে পড়বে। জল যে উপরের দিকে চাপ দেয় কি করে দেখবে? এক টুকরো কাঠকে যদি সোজাসুজি জলে ডোবাবার চেষ্টা কর দেখবে তোমাকে উপর থেকে চাপ দিতে হচ্ছে। যদি ছেড়ে দাও দেখবে কাঠের টুকরোটা সঙ্গে সঙ্গে উপর দিকে উঠে আসছে। জলের ঊর্ধ্বমুখী চাপের জন্যই এটা হয়।

জলের চাপের আরো নানা উদাহরণ তোমরা চোখের সামনে দেখতে পাও। কলের জলের চাপ ইচ্ছেমত আঙুল দিয়ে চেপে কম বেশি করে দেখেছ। জলের এই চাপের ব্যাপারটা মনে রেখেই জলের বাঁধগুলো নিচের দিকে বেশি মোটা করে তৈরি হয়, কারণ নিচের দিকে জলের চাপ বেশি। জলের গভীরতা যত বাড়বে চাপ তত বাড়বে।

আর্কিমিডিস

আজ থেকে দু হাজার বছর আগে আর্কিমিডিস নামে এক গ্রীক বিজ্ঞানী ছিলেন। অঙ্কে অসাধারণ মাথা ছিল তাঁর। তাছাড়াও বলবিদ্যা বা মেক্যানিক্স্, স্থিতিবিদ্যা বা স্ট্যাটিক্স্, উদস্থিতিবিদ্যা বা হাইড্রোস্ট্যাটিক্স্ ইত্যাদি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নানারকম নতুন চিন্তা করেছেন তিনি। এ ছাড়া নানারকম বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল প্রয়োগ করে অনেক যন্ত্রও তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন—তখনকার দিনে তা দেখে সকলে খুবই আশ্চর্য হয়ে যেত। একবার অনেকগুলি বিরাট আয়নার সাহায্যে সূর্যরশ্মি প্রতিফলন করে তিনি শত্রুপক্ষের জাহাজে আগুন লাগিয়ে দেন। দূর থেকে গোলা ছোঁড়ার এমন সব ব্যবস্থা তিনি করেন যাতে শত্রুপক্ষের জাহাজ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা হয়েছিল যে শহরের প্রাকার থেকে একটা দড়ি ঝুলতে দেখলেই লোকেরা আর্কিমিডিসের নতুন কোন ফন্দী মনে করে আতঙ্কে অস্থির হত।

আলেকজাণ্ড্রিয়াতে সেই সময় এক বিশাল গ্রন্থাগার ছিল। নালন্দাকে বাদ দিলে এটাই পৃথিবীতে সর্বপ্রাচীন বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র। আর্কিমিডিস এই কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সিরাকিউজের রাজা নাকি তাঁকে বলেছিলেন তাঁর মুকুটে সোনার সঙ্গে খাদ মেশানো আছে কিনা মুকুটটি না ভেঙে তা বার করে দিতে। আর্কিমিডিস চিন্তা করতে লাগলেন, কি করে এই সমস্যার সমাধান করা যায়। একদিন স্নানের সময় জলের টবে গা ডোবাতে গেলেন, খানিকটা জল চলকে টব থেকে মাটিতে পড়ে গেল, এবং গা ডুবিয়ে বসার পর শরীরটা অনেক হালকা বোধ হল। বলা হয় এই দেখেই নাকি তিনি উঠে দৌড়তে শুরু করেন—আর চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, 'ইউরেকা, ইউরেকা'। গ্রীক ভাষায় 'ইউরেকা' শব্দের অর্থ 'পেয়েছি'। অর্থাৎ সমস্যার উত্তর খুঁজে পেয়েছি। গল্পটা কতটা সত্যি জানা নেই।

উত্তরটা হল এই। আর্কিমিডিস দেখলেন জলের টবে তাঁর

শরীর ডোবানোর ফলে খানিকটা জল স্থানচ্যুত হল। কোনো জিনিস ডোবালে কি পরিমাণ জল চলকে পড়ে যাবে তার হিসেব করলেন তিনি। এই সব পর্যবেক্ষণের পর তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে কোন বস্তুকে তরল পদার্থে সম্পূর্ণ ডোবালে তা ঐ বস্তুর আয়তনের সমান তরল অপসারিত করবে। ঐ অপসারিত সম-আয়তন তরলের ওজন ডোবানো অবস্থায় বস্তুর ওজন থেকে কমে যাবে। ভাসমান পদার্থ সম্বন্ধে লেখা তাঁর বইয়ে তিনি আলোচনা করে দেখিয়েছেন বিভিন্ন আকারের কঠিন পদার্থ কিরকম ভাবে তরল পদার্থে ভেসে থাকবে। এটিই বিখ্যাত আর্কিমিডিসের নীতি।

দীর্ঘকাল অবরোধের পর সিরাকিউজের পতন ঘটে। তখন রোমান শত্রুরা শহরের ভিতরে ঢুকে ইচ্ছেমত লুঠতরাজ আরম্ভ করে দেয়। সেই সময় কোন এক রোমান সৈন্যের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

আর্কিমিডিসের নীতি

কোন বস্তুকে তরলে আংশিক বা সম্পূর্ণ নিমজ্জিত করলে বস্তুর ওজনের আপাত-হ্রাস হয়। এই আপাত-হ্রাস বস্তু যে পরিমাণ তরল অপসারিত করে, তা তার ওজনের সমান।

পরীক্ষার ও অঙ্কের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় যে আর্কিমিডিসের এই নীতি সত্য।

প্লবতা ও ভাসন

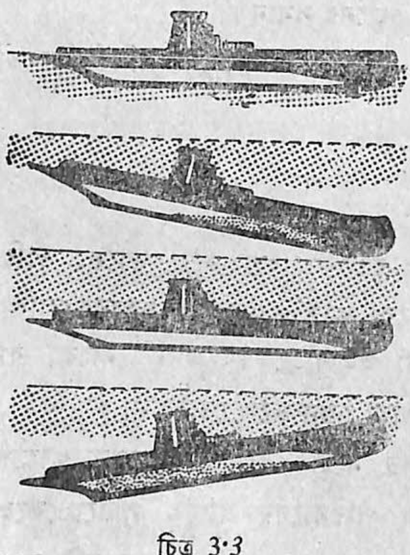
আমরা সাধারণ ভাবে বলে থাকি হালকা বস্তু জলে ভাসে, ভারি জিনিস ডুবে যায়। এক টুকরো কাঠ ও একই আয়তনের লোহা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেই এটা প্রমাণ হবে। অথচ নৌকো বা জাহাজ তো কম ভারি নয়। তারা কেন জলে ডোবে না ?

যখন এক টুকরো কাঠ জলের মধ্যে ফেলা হয় তখন কাঠের জলে ডোবানো অংশের সমান পরিমাণের জলকে সরিয়ে ফেলে কাঠের টুকরোটা সেখানে নিজের জায়গা করে নেয়। কাঠটি যখন

ভাসে তখন আকমিডিসের নীতি অনুযায়ী কাঠের ওজন অপসারিত জলের ওজনের সঙ্গে সমান, নয়ত কম। শুধু কাঠ নয়, যে কোন বস্তুর বেলায় এই কথা খাটে। বস্তুর ওজন যদি অপসারিত জলের ওজনের চেয়ে কম হয় তবে বস্তু কিছু অংশ জলের উপরে রেখে ভাসতে থাকবে। বস্তুর ওজন যদি অপসারিত জলের ওজনের সঙ্গে সমান হয় তবে বস্তু জলে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসবে। আর বস্তুর ওজন যদি অপসারিত জলের ওজনের চেয়ে বেশি হয় তবে বস্তু জলে ডুবে যাবে।

সমুদ্রগামী বড় জাহাজ যদি দেখে থাক তাহলে জানবে জলের উপরে জাহাজের যতটা অংশ চোখে পড়ে তার চেয়ে কত বেশি অংশ থাকে জলের নিচে, যাকে বলে জাহাজের খোল। এই খোল ফাঁপা। জাহাজ জলে ভাসাবার পর যতটা জলকে জাহাজ স্থানচ্যুত করছে তার ওজনের চেয়ে মালপত্র ভর্তি জাহাজের ওজন যদি কম হয় তবেই জাহাজটা ভেসে থাকবে।

তরলের স্বাভাবিক ধর্ম অনুসারে জল তার মধ্যে ডোবানো বস্তুর উপর চাপ দেয়। এই চাপ যে উপর, নিচে ও পাশে তা আমরা জেনেছি। জলে ডোবানো বস্তুর উপর জলের চাপ উর্ধ্বমুখী। এই উর্ধ্বমুখী চাপকে বলে বয়ান্সি বা প্লবতা। প্লবতা আমাদের জলে ভেসে থাকতে সাহায্য করে।



চিত্র 3·3

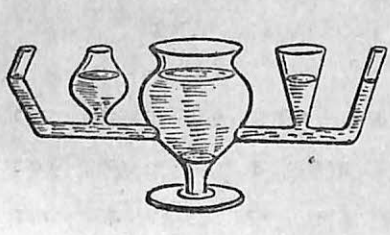
সাবমেরিনের ওঠানামাও এই সূত্রের সাহায্যেই সম্পাদিত হয়। জাহাজের ফাঁপা খোলটির মধ্যে জল পুরে যদি তাকে ক্রমশ ভারি করা হতে থাকে, যাতে অপসারিত জলের

চেয়ে তার ওজন বেশি হয়ে যায় তাহলেই সাবমেরিন জলপৃষ্ঠের তলায় চলে যাবে (চিত্র 3.3)। যত ওজন বাড়ানো হবে ডুবো জাহাজ ততই জলের নিচে নামবে। আবার ঐ ওজন কমাতে থাকলেই সাবমেরিন ভেসে উঠবে।

জাহাজ বা বড় স্টীমারে চাকার মত দেখতে বেল্ট বা কোমর বন্ধনী দেখে থাকবে। এদের লাইফ-বেল্ট বলে। সমুদ্রে জাহাজ ডুবে গেলে নাবিকেরা প্রাণ বাঁচাবার জন্য এগুলি ধরে জলে ভেসে থাকে। লাইফ-বেল্টের ভিতরটা ফাঁপা। এদের ওজনের তুলনায় অপসারিত জলের ওজন অনেক বেশি হওয়ায় ঊর্ধ্বমুখী চাপ এত বেশি যে বেল্ট ও নাবিক উভয়কেই জলে ভাসিয়ে রাখে। কলকাতার নদীতে তোমরা হয়ত বয়া দেখেছ। মাঝ নদীতে স্টীমার বাঁধার জন্য অথবা অন্ধকার রাতে জাহাজকে পথের নিশানা দেওয়ার জন্য আলো জ্বালিয়ে রাখতে এগুলি ব্যবহার করা হয়। একই নীতি ও পদ্ধতিতে বয়া তৈরি করা হয়ে থাকে।

সমুচ্চশীলতা

তরল পদার্থের আর একটি ধর্মের নাম সমুচ্চশীলতা। একটি পাত্রে জল ঢাললে দেখা যাবে জলের উপরের অংশ মাটির সঙ্গে সমান্তরাল। এখন ঐ পাত্রের সঙ্গে যদি আরেকটি পাত্র কোন নল দ্বারা সংযুক্ত থাকে, দেখা যাবে একটিতে জল ঢাললেই নল দিয়ে জল অন্য পাত্রে প্রবেশ করবে এবং দুটি পাত্রই সমান উচ্চতায় দাঁড়াবে। পাত্রগুলির আকার বা আয়তন যেমনই হোক না কেন প্রত্যেকটি পাত্রে এই উচ্চতা সমান থাকবে (চিত্র 3.4)। এই ধর্ম কাজে লাগান হয় শহরের জল সরবরাহ ব্যবস্থায়। কলকাতায় তোমরা টালার ট্যাঙ্ক হয়তো



চিত্র 3.4

দেখেছ। সেখান থেকে শহরের বাড়ি বাড়ি জল সরবরাহ করা হয়। ট্যাঙ্কটা অত উঁচুতে করার কারণ উঁচু বাড়িতেও তাহলে পাইপে করে জল পৌঁছে যাবে, কারণ সমুচ্চশীলতার জন্য জল ট্যাঙ্কের উচ্চতায় যাবার চেষ্টা করে। শ্যামবাজারের কাছে জল যতটা উচ্চতায় উঠতে পারে বালিগঞ্জে ততটা উচ্চতায় উঠতে পারে না। কেন বল ত?

জলের ব্যবহারিক প্রয়োগ

প্রত্যেক দিন নানা কাজে জল আমরা ব্যবহার করি। বাড়িতে, চাষের জমিতে, কলকারখানায় জল আমাদের সব সময় কাজে আসছে। একজন লোকের সারা দিনে 30 গ্যালন বা 150 লিটার জল দরকার হয়। এই জল অবশ্য খরচ হলেও নষ্ট হয় না, নালা দিয়ে শেষ পর্যন্ত নদী বা সমুদ্রে পড়ে। সেখান থেকে বাষ্প, মেঘ ও ক্রমে বৃষ্টি হয়ে আবার পরিষ্কার জল হয়ে ফিরে আসে। কিংবা বৈজ্ঞানিক উপায়ে নদী বা হ্রদ থেকে জল নিয়ে পরিস্রুত করে সেটা আমাদের কাছে চলে আসে। পলতার জল সরবরাহ কেন্দ্রের কথা তোমরা হয়ত শুনেছ। সেখান থেকে পরিস্রুত জল টালার ট্যাঙ্কে জমা হয়। বোম্বাই শহরের জল সরবরাহ হয় পাওয়াই নামক হ্রদ থেকে। গুজরাটের শুষ্ক অঞ্চলে লোকে বাড়ির ছাদে চৌবাচ্চা বানিয়ে বৃষ্টির জল ধরে রাখে এবং ঐ জল দিয়ে সারা বছর চালায়।

এ ছাড়া জলের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। প্রাকৃতিক জল-প্রপাত বা বাঁধ তৈরি করে কৃত্রিম জলপ্রপাত সৃষ্টি করে পড়ন্ত জল দিয়ে টারবাইনের চাকা ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করা হয়।

তরলের অন্যান্য ধর্ম : কৈশিক টান

গাছের গোড়ায় জল ঢাললে সেই জল শেকড় ও ডালপালা বেয়ে কি করে উপরে ওঠে কখনো ভেবে দেখেছ কি? ঠিক একই রকম ভাবে লেখার কলমে কালি ভরা হলে সেই কালি নিবে এসে পৌঁছয়। বৃষ্টির জল জানালার শার্শি বেয়ে পড়লে দেখবে খানিকটা জল শার্শির গায়ে আটকে থাকছে। জলে আঙুল ডুবিয়ে তুলে

নিলে খানিকটা জল আঙুলে লেগে থাকে। খুব সরু সরু চুল বা সুতোর মত জিনিস বেয়ে জলের উপরে ওঠার এই ক্ষমতাকে বলা হয় **কৈশিক টান**। ইংরেজীতে ক্যাপিলারি অ্যাকশন। জলের এই কৈশিক টানের জন্যই কলম দিয়ে কাগজে লিখলে কাগজ সেই কালি টেনে নেয়, তাই কালির লেখা সহজে মুছতে চায় না। আরো নানা ব্যাপারে কৈশিক টান কাজ করে। চেষ্টা করলেই দেখতে পাবে।

পৃষ্ঠ টান : পুকুরের জলের উপর দিয়ে কখন কখন দেখবে একরকম মাকড়সা লম্বা পা ফেলে হেঁটে যাচ্ছে। তারা ডুবে যাচ্ছে না কেন ? জলের উপরের স্তরে একটা টান রয়েছে। তোমরা অণু পরমাণুর কথা পরে পড়বে। জলের সবচেয়ে উপরের স্তরের অণুগুলোর পরস্পরের মধ্যে টান আছে বলেই এই রকম ঘটেছে। একে বলে জলের **পৃষ্ঠ টান**। ইংরেজীতে সারফেস টেনশন।

পরীক্ষা করে দেখবে একটা ব্লেড বা ছুঁচ জলের এই উপরের স্তরে ভাসিয়ে রাখা যায়, কিন্তু যদি সেগুলো উপরের স্তর ভেদ করে নিচে যায় তাহলে ডুবে যাবে। পৃষ্ঠ টানের আরো পরীক্ষা আছে। একটা বোতলে জল ঢালতে থাক, বোতলটা ভর্তি হয়ে গেল। এরপর খুব অল্প অল্প করে আরো জল ঢালতে থাক। দেখবে বোতলের মুখ ছাড়িয়ে জলটা সামান্য উঁচু হয়ে রইল। পৃষ্ঠ টান এই জলকে ধরে রেখেছে, তা না হলে কানা ছাড়িয়ে গেলেই জলটা পড়ে যেত।

জলের উপর তেল ঢাললে তেলটা উপরে ভাসে, পৃষ্ঠ টান ভেদ করে নিচে যেতে পারে না। এইজন্য মশা মারবার জন্য নালা নর্দমাতে কীটনাশক তেল ছড়ানো হয়। পৃষ্ঠ টানের জন্য তেলটা উপরের স্তরে ছড়িয়ে যাবে, ফলে মশার শূককীটগুলো নিঃশ্বাস নিতে না পেরে মারা যায়।

খর জল ও মৃদু জল

হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলে তৈরি হয় জল, একথা আগে বলা হয়েছে। এছাড়াও জলের মধ্যে অন্য নানা পদার্থ মিশে যায়। যেমন নদী যখন মাটি বা পাথরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় সেখান থেকে কিছু খনিজ গুলে জলের মধ্যে মেশে। চুনাপাথর মেশানো জমির উপর দিয়ে আসার সময় ক্যালসিয়ম মেশে। যে জলে ক্যালসিয়মের পরিমাণ বেশি তাকে বলে **খর জল**। এই জলে সাবানের ফেনা হয় না। যে জলে সহজে সাবানের ফেনা হয় তাকে বলে **মৃদু জল**। বৃষ্টির জল মৃদু, কারণ তাতে তখনো অন্য কোন খনিজ মেশেনি।

প্রশ্ন

1. তরলের ধর্ম সম্বন্ধে যা জান লেখ। কঠিন ও গ্যাসের ধর্মের সঙ্গে এর পার্থক্য কোথায় ?

2. তরলের পার্শ্বচাপ, ঊর্ধ্বচাপ ও নিম্নচাপ সম্বন্ধে যা জান লেখ। একটি সহজ পরীক্ষার সাহায্যে এই তিনটি চাপ প্রমাণ কর।

3. আর্কিমিডিসের নীতি কি ? প্লবতা ও ভাসন বলতে কি বোঝ ? আর্কিমিডিস নীতি অনুযায়ী প্লবতা ও ভাসন ব্যাখ্যা কর। জাহাজ জলে ভাসে কেন ?

4. সমুচ্ছশীলতা বলতে কি বোঝ ? শহরে বাড়িতে বাড়িতে কি ভাবে জল সরবরাহ করা হয়ে থাকে ?

5. টীকা লেখ : মৃদু জল ও খর জল।

6. শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

(ক) কঠিন বস্তুর নিজস্ব — ও — আছে, তরলের নিজস্ব — আছে কিন্তু — নেই, গ্যাসের নিজস্ব — ও — কোনটিই নেই।

(খ) জলের — উপরে, পাশে ও নিচে সর্বত্রই —।

(গ) তরলের ধর্ম — থেকে — প্রবাহিত হওয়া।

(ঘ) যে কোন তরলের পৃষ্ঠ —।

7. ভুল শব্দটি কেটে দাও :

(ক) তরল প্রবাহিত হয় উঁচু থেকে নিচুতে/নিচু থেকে উঁচুতে।

(খ) নিমজ্জমান বস্তুর উপর জলের চাপ উর্ধ্বমুখী/নিম্নমুখী।

(গ) খনিজ পদার্থ দ্রবীভূত থাকে খর জলে/মৃদু জলে।

(ঘ) জলে পোকামাকড় ভেসে বেড়ায় পৃষ্ঠ টানের জন্য/জলের বেশি ঘনত্বের জন্য।

(ঙ) জলে কোন বস্তু ডোবালে বস্তুর ওজনের যে আপাত হ্রাস হয় তা অপসারিত জলের ওজনের সমান/কিছু কম।

8. নিচের কোনটি ভুল, কোনটি ঠিক ?

(ক) জলের গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে চাপ কমে।

(খ) জলে বা বাতাসে চাপ সবদিকেই সমান।

(গ) আধারের তলদেশ এবড়ো খেবড়ো হলে জলের পৃষ্ঠ এবড়ো খেবড়ো হবে।

9. বলো কেন। (৩।৪ লাইনে উত্তর দাও)

(ক) টালা জল সরবরাহ কেন্দ্রে জলাধারগুলো অত উঁচুতে রাখা হয়।

(খ) নদীর বাঁধের নিচের দিক ক্রমশ বেশি মোটা।

(গ) একটা নির্দিষ্ট গভীরতার নিচে গেলে ডুবুরিরা বর্ম পরে।

(ঘ) লোহার টুকরো জলে ডোবে কিন্তু জাহাজ জলে ভাসে।

10. পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ কর :

(ক) জলের চাপ গভীরতার সঙ্গে বাড়ে।

(খ) তরলের যে কোন বিন্দুতে উপরে, নিচে ও পাশে চাপ সমান।

(গ) তরলে কোন বস্তু ডোবালে বস্তুর ওজনের আপাত হ্রাস হয়।

(ঘ) সরু ও মোটা দুটো নল যুক্ত থাকলে তাদের একটাতে তরল ঢাললে উভয় নলে তরলের উচ্চতা সমান।

(ঙ) সব তরল একই হারে উঁচু থেকে নিচুতে প্রবাহিত হয় না।

11. কাকে বলে ? (৩।৪ লাইনে উত্তর দাও)

(ক) আর্কিমিডিসের নীতি

(খ) প্লবতা

(গ) ভাসন

(ঘ) সমুচ্চশীলতা

12. শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

(ক) সাবমেরিন তৈরি করা হয় — নীতি কাজে লাগিয়ে।

(খ) জল সরবরাহ ব্যবস্থায় কাজে লাগানো হয় — নীতি।

(গ) ক্যালসিয়ম ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ দ্রবীভূত থাকে — জলে।

(ঘ) সাবানের ফেনা হয় — জলে।

(ঙ) সাবানের ফেনা হয় না — জলে।

13. বলো কেন।

(ক) নদী থেকে সমুদ্রে এসে জাহাজের জলে নিমজ্জমান অংশ কমে যায়।

(খ) জাহাজে বেশি মাল চাপালে জলে নিমজ্জমান অংশ বাড়ে।

(গ) মাটি থেকে ছাড়ার সময় বেলুনের ভিতর আংশিক বাতাস ভর্তি করা হয়।

14. সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :

আর্কিমিডিস, সাবমেরিন, লাইফবেল্ট, সমুচ্চশীলতা, প্লবতা, ভাসন, জল সরবরাহ ব্যবস্থা, খর জল ও মৃদু জল, পৃষ্ঠ টান।

---

৪ জড় বস্তু

বস্তু কী ?

তোমাদের চারপাশে চাইলেই অনেক ধরনের জিনিস দেখতে পাবে। জল, হাওয়া, মাটি, পাথর, গাছ, পাখি, আরও কত রকমের জিনিস। হাত দিয়ে তাদের অনুভব করার চেষ্টা কর। দেখবে কোনটা শক্ত, কোনটা নরম, কোনটা সবুজ, কোনটা ধূসর, বা অন্য কোন রঙের। এক টুকরো লোহা এবং সমান আয়তনের এক টুকরো তুলো নাও। দেখবে লোহা অনেক বেশি ভারি। তাদের গন্ধ আর বর্ণও আলাদা। স্বাদও এক নয়। তবে স্বাদ নেবার জন্য সব জিনিস মুখে দেবার চেষ্টা করবে না। অনেক জিনিস বিষ। আবার এমন কিছু জিনিস আছে যা চোখে দেখতে পাওয়া যায় না, কিন্তু অনুভব করা যায়। যেমন বাতাস। মানুষ ও অন্য প্রাণী চলাফেরা করতে পারে, কিন্তু ইট, পাথর প্রভৃতি বস্তুর নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই।

এই সব পদার্থের উপস্থিতি আমরা হয় দেখে নয় অনুভব করে বুঝতে পারি। এরা সকলেই কিছু কিছু জায়গা অধিকার করে আছে। এদের সকলেরই কিছু না কিছু ওজন আছে।

যা আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে ধরা দেয়, যাদের ওজন আছে এবং যারা কিছু জায়গা অধিকার করে আছে তাদের সকলকে বলা হয় **বস্তু**। যে সব বস্তুর প্রাণ আছে তাদের বলে **জীব** আর যাদের প্রাণ নেই তাদের বলে **জড়**।

জড় বস্তুর আরো একটি ধর্ম নিজের অবস্থাকে আঁকড়ে ধরে থাকা। যে কোন বস্তু স্থির অবস্থায় থাকলে নিজে থেকে এই স্থির অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে না। আবার বাতাসের ঘর্ষণ যদি না থাকত তবে যে কোন বস্তুকে একবার চালিয়ে দিলে

চিরদিন চলতে থাকত। জড় বস্তুর এই ধর্মকে বলে জড়তা। বস্তুর জড়তা সম্বন্ধে তোমরা পরে আরো ভাল করে পড়বে।

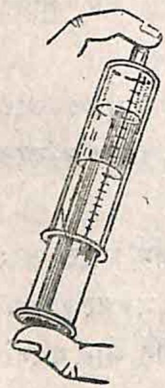
নিজে কর

চারপাশে যে সব বস্তু দেখতে পাও তার মধ্যে থেকে কিছু বস্তু কুড়িয়ে নিয়ে এস। নিচের তালিকাতে যে সব গুণ আছে তোমরা বস্তুগুলিতে সে সব গুণ আছে কিনা লক্ষ করে দেখ।

বস্তুর নাম	জড়	জীব	কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উপস্থিতি বোঝা গেল	ভারি না হালকা	জায়গা জুড়ে আছে কিনা	কঠিন, তরল অথবা গ্যাস

সব বস্তু চোখে দেখা যায় না, যেমন বাতাস। কিন্তু বাতাস কি জায়গা জুড়ে আছে? একটা পরীক্ষা করে দেখ।

ডাক্তারদের ইনজেকশন দেবার একটা সিরিঞ্জ নাও (চিত্র 4.1)। দেখবে সিরিঞ্জের গায়ে দাগ কাটা আছে। প্রতিটি দাগ একটি নির্দিষ্ট আয়তনকে বোঝায়। সিরিঞ্জের ছুঁচ সরিয়ে তার ভিতর কিছু জল পুরে নাও। এইবার সিরিঞ্জের মুখ আঙুলের ডগা দিয়ে বন্ধ করে পিস্টনটি দিয়ে আস্তে আস্তে চাপ দাও। দেখবে পিস্টনটি একটুও এগোচ্ছে না। আঙুল সরিয়ে নিলে জল সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়বে। এইবার জল ফেলে পিস্টনটি পিছন দিকে সরিয়ে নাও। পুরো সিরিঞ্জ এখন বাতাসে ভর্তি। আগের মত মুখ আঙুলের ডগার সাহায্যে বন্ধ করে এইবার পিস্টন দিয়ে বাতাসে চাপ দাও। দেখবে পিস্টন ক্রমশ এগিয়ে এক জায়গায় থেমে যাবে। আর এগোবে না। বাতাসের অণুগুলি অনেক দূরে



চিত্র 4.1

দূরে ছিল। চাপের জন্য এরা পরস্পরের এত কাছে এসে পড়বে যে পিস্টনের পক্ষে আর এগোন সম্ভব হবে না। এ থেকেই প্রমাণ হয় বাতাস জায়গা জুড়ে আছে। শুধু বাতাস কেন, সকল অদৃশ্য গ্যাসের বেলায় একই কথা খাটে।

একটা কঠিন লোহার ফলককে চেপে ধরে খুব জোরে চাপ দাও। দেখবে তার আয়তনের পরিবর্তন হচ্ছে না। একটা কাঠি খুব বেশি চাপে ভেঙে যেতে পারে কিন্তু আয়তন একই থাকবে। রবারের বেলুনে চাপ দিলে ছোট হবে। রবারের সুতো টানলে বাড়ে। জলকে চাপ দিলে অল্প কমে, বাতাস সহজেই সঙ্কুচিত হয়।

বস্তুর উপর চাপের পরিবর্তনে তার আয়তনের পরিবর্তন হয়। বস্তুর এই ধর্মকে বলে **সংকোচনশীলতা** বা কমপ্রেসিবিলিটি। বেশির ভাগ কঠিন বস্তু সংকোচনশীল নয়, তরল অল্প সংকোচনশীল, গ্যাস সহজেই সংকোচনশীল।

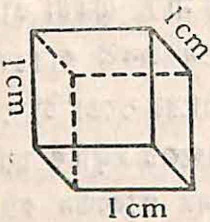
দুটো বস্তু একসঙ্গে একই জায়গা দখল করে থাকতে পারে না। জলে যে কোন বস্তু ডোবালে দেখবে জল সরে গিয়ে তাকে জায়গা করে দেয়। বস্তুর এই ধর্মকে বলে **অভেদ্যতা** বা ইমপেনিট্রেবিলিটি।

সব বস্তুর কিন্তু নির্দিষ্ট আকার নেই। কঠিন বস্তুর নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন আছে। তরলের আকার নেই, আয়তন আছে। গ্যাসের আকারও নেই, আয়তনও নেই। তরল যে পাত্রে থাকে তার আকার নেয়। গ্যাস যে পাত্রে ভর্তি করা হয় তার আয়তন দখল করে।

প্রত্যেক বস্তুর **ওজন** আছে। হাতে নিলেই ওজনের তারতম্য বুঝতে পারবে। তুলাদণ্ডে বা নিক্তিতে ওজন করলে সঠিক ওজন পাবে। বাতাসের ওজন আছে। শুধু বাতাস কেন সব গ্যাসেরই ওজন আছে। গবেষণাগারে অটো ফন গেরিক কি ভাবে বাতাসের ওজন মেপেছেন তোমরা আগেই পড়েছ।

সব বস্তুর ওজন কিন্তু এক নয়। তোমরা বলতে শুনেছ লোহা ভারি, তুলো হালকা। এক kg লোহা ও এক kg তুলোর ওজন

সমান। তবে হালকা, ভারি কথাগুলো আসে কেন? লক্ষ কর এক kg লোহার আয়তন কতটুকু আর এক kg তুলোর আয়তন কত বেশি। যদি একক আয়তনের লোহা ও একক আয়তনের জল নিয়ে ওজন করে দেখ, দেখবে লোহা ভারি। একক আয়তন কাকে বলে? কোন পাত্রের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা যদি 1 cm হয় তবে সেই পাত্রের আয়তনকে একক আয়তন বা এক ঘন সেন্টিমিটার বা 1 cc বলে। 4.2 চিত্রে একক আয়তন দেখান হল। যে বস্তুর ওজন বেশি সেই বস্তুতে পদার্থের পরিমাণ বেশি। পদার্থের পরিমাণকে বস্তুর ভর বা ইংরেজীতে ম্যাস বলে। একক আয়তন বিশিষ্ট বস্তুর ভরকে তার ঘনাঙ্ক অথবা ইংরেজীতে ডেনসিটি বলে। ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ঘনাঙ্ক ভিন্ন। ঘনাঙ্ক বস্তুর একটি ধর্ম।



চিত্র 4.2

সমস্ত বস্তুরই এই কয়টি ধর্ম আছে। ধর্মগুলি হল: (ক) ওজন বা ওয়েট, (খ) ঘনাঙ্ক বা ডেনসিটি, (গ) কাঠিন্য বা হার্ডনেস, (ঘ) গন্ধ বা ওডার, (ঙ) বর্ণ বা কালার, (চ) আকৃতি বা ডাইমেনশন, (ছ) আয়তন বা ভল্যুম, (জ) সংকোচনশীলতা বা কমপ্রেসিবিলিটি, (ঝ) অভেদ্যতা বা ইমপেনিট্রেবিলিটি।

নিজে কর

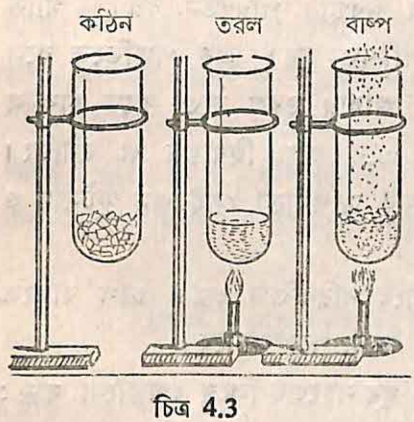
যে সব বস্তুগুলি আশপাশ থেকে জোগাড় করেছ সেগুলি তাদের ধর্ম অনুযায়ী বেছে নাও। তারপর নিচের তালিকা অনুযায়ী তাদের ধর্মগুলি খাতায় লেখ।

বস্তুর নাম	ওজন	ঘনাঙ্ক	কাঠিন্য	গন্ধ	বর্ণ	আকৃতি	আয়তন	সংকোচন-শীলতা	অভেদ্যতা

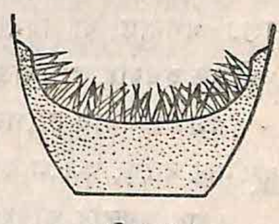
বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন

তোমার চারপাশের বস্তুগুলি পরীক্ষা করে দেখেছ তাদের কোনটি তরল, কোনটি কঠিন, কোনটি গ্যাস। পৃথিবীর সব বস্তুই সাধারণ তাপমাত্রায় এই তিনটি অবস্থার যে কোন একটিতে থাকে। বস্তুর এই অবস্থা কিন্তু স্থায়ী নয়। বস্তুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে অবস্থারও পরিবর্তন হয়। যে কোন কঠিন বস্তু গরম করলে তরল ও তরল বস্তু গ্যাসে পরিণত হতে পারে। আবার গ্যাসকে ঠাণ্ডা করলে তরল ও তরলকে ঠাণ্ডা করলে কঠিন বস্তুতে পরিণত হয়। একটা পরীক্ষা কর।

(1) একটা টেস্ট টিউবে কয়েক টুকরো বরফ নাও (চিত্র 4.3)। বুনসেন দীপের সাহায্যে গরম করলে দেখবে সেটি তরলে পরিণত



চিত্র 4.3



চিত্র 4.4

হয়েছে। আরও গরম কর, জল ফুটতে থাকবে ও বাষ্প হয়ে উপরে উঠবে।

(2) একটা কাচের পাত্রে কয়েক টুকরো গন্ধক নাও। বুনসেন দীপের সাহায্যে গরম করতে থাক। দেখবে যথেষ্ট গরম হলে সোনালি হলুদ রঙের তরলে পরিণত হয়েছে। আরও গরম করলে দেখবে লাল রঙের গন্ধকের বাষ্প উপরে উঠছে। আবার তরল গন্ধককে ঠাণ্ডা করলে দেখবে ছুঁচের মত সরু সরু গন্ধকের কঠিন কেলাস দেখা যাচ্ছে (চিত্রে 4.4)।

সব বস্তু কিন্তু একই তাপমাত্রায় তরল বা গ্যাস হয় না। ভিন্ন ভিন্ন বস্তু ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রায় অবস্থার পরিবর্তন করে। যে তাপমাত্রায় কঠিন বস্তু তরলে পরিণত হয় সেই তাপমাত্রাকে **গলনাঙ্ক** বা মেলটিং পয়েন্ট বলে। তরলে পরিণত হওয়াকে বলে **গলন** বা মেলটিং। সেই ভাবে তরল বস্তু যে তাপমাত্রায় গ্যাসে পরিণত হয় সেই তাপমাত্রাকে বলে বস্তুটির **স্ফুটনাঙ্ক** বা বয়লিং পয়েন্ট এবং পদ্ধতিটিকে বলে **স্ফুটন** বা বয়লিং। বরফের গলনাঙ্ক 0°C, বা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস। ন্যাপথালিনের 80°C, গন্ধকের 113°C এবং পারদের —39°C। লোহার গলনাঙ্ক 1535°C। জলের স্ফুটনাঙ্ক 100°C, পারদের 356.8°C। গলিত লোহার স্ফুটনাঙ্ক 2800°C।

বস্তুকে ঠাণ্ডা করতে থাকলে অবস্থার পরিবর্তন হয়। গ্যাস ঠাণ্ডা হতে থাকলে তরলে পরিণত হয়। এই পদ্ধতিকে বলে **ঘনীভবন** বা কনডেনসেশন। আবার তরল ঠাণ্ডা হতে থাকলে কঠিন বস্তুতে পরিণত হয়। একে বলে **হিমায়ন** বা **ফ্রীজিং**। বস্তুর গলনাঙ্ক বা হিমাঙ্ক একই তাপমাত্রা, সেইরকম স্ফুটনাঙ্ক ও ঘনীভূত হওয়ার তাপমাত্রা এক।

বস্তুর স্ফুটনাঙ্ক চাপের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়। চাপ বাড়লে স্ফুটনাঙ্ক বাড়ে, কমলে কমে। কেন, পরে জানবে।

বস্তুর অবস্থার পরিবর্তনকে খুব সহজেই লিখে বোঝানো যায়:

কঠিন
তাপ দিয়ে ↓ ↑ তাপ বার করে
তরল
তাপ দিয়ে ↓ ↑ তাপ বার করে
গ্যাস

ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম

এতক্ষণ বস্তুর যে ধর্মগুলির কথা তোমরা পড়লে এগুলিকে বস্তুর **ভৌত ধর্ম** বলে। কোন বস্তুর উপাদান পরিবর্তিত হয়ে অন্য কোন

বস্তুতে রূপান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত যে সব ধর্মের দ্বারা আমরা বস্তুটিকে সনাক্ত করতে পারি সেগুলি বস্তুর ভৌত ধর্ম। ভৌত ধর্মের দ্বারা বস্তুর বাইরের গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।

ভৌত ধর্ম ছাড়াও বস্তুর আর একটি ধর্ম আছে, তাকে বস্তুর **রাসায়নিক ধর্ম** বলে। বস্তুর রাসায়নিক উপাদান ও রাসায়নিক বিক্রিয়া সংক্রান্ত ধর্মই রাসায়নিক ধর্ম। যেমন ধর তামার টুকরোর উপর কয়েক ফোঁটা নাইট্রিক অ্যাসিড ফেললে রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু হবে ও ভুরভুর করে বাদামি রঙের গ্যাস বার হতে থাকবে। চিনির উপর লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড ঢাললে চিনি কার্বনে পরিণত হয়। এগুলি রাসায়নিক বিক্রিয়া। কোন বস্তুর উপাদান অথবা বস্তুর এই বিক্রিয়া তার যে ধর্মের উপর নির্ভর করে তাই তার রাসায়নিক ধর্ম। কোন বস্তুকে সনাক্ত করার জন্য ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম উভয়ই জানা দরকার।

বস্তুর ভৌত ধর্মের পরিবর্তনকে **ভৌত পরিবর্তন** এবং রাসায়নিক ধর্মের পরিবর্তনকে **রাসায়নিক পরিবর্তন** বলে। ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের কয়েকটি উদাহরণ নিচে দেওয়া হল।

ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন : পরীক্ষা

ভৌত পরিবর্তন	রাসায়নিক পরিবর্তন
1. একটি প্ল্যাটিনম তার গরম করলে দেখবে প্রথমে গরম হবে ও পরে অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে আলো দিতে থাকবে। উৎস সরিয়ে নিলে ঠাণ্ডা হয়ে আগের অবস্থায় ফিরে আসবে।	1. একটি ম্যাগনেসিয়ম তারকে গরম করলে দেখবে তারটি পুড়ে বেশ জোরালো আলো দিচ্ছে। সাদা ছাইকে আগের অবস্থায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এই ছাই এক নতুন পদার্থে পরিণত হয়েছে—নাম ম্যাগনেসিয়ম অক্সাইড।

2. এক টুকরো গন্ধক কাচের পাত্রে নিয়ে গরম করলে সোনালি হলুদ তরলে পরিণত হবে এবং আরো গরম করলে বাদামি লাল রঙের বাষ্পে পরিণত হবে। ঠাণ্ডা করলে আবার তরল ও আরো ঠাণ্ডা করলে কঠিন গন্ধক পাওয়া সম্ভব।

2. একটা ধুনাচীতে গরম আগুন নিয়ে গন্ধক গুঁড়ো ছড়াতে থাকলে সালফার ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়। এটি রাসায়নিক পরিবর্তন। সালফার ডাই-অক্সাইডের ধোঁয়ায় ভিজে লাল জবাফুল ধরলে দেখবে সেটি সাদা হয়ে যাচ্ছে।

রাসায়নিক পরিবর্তনের আরো কয়েকটি উদাহরণ

1. কয়লা পোড়ালে অক্সিজেনের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয়।

2. কিছু চিনি একটা কাচের পাত্রে নিয়ে গরম করলে কিছুক্ষণ পরে নিচে কালো রঙের কার্বন পড়ে থাকে।

যখন দুটি বা বেশি বস্তু যুক্ত হয়ে বা তাপের প্রভাবে কোন বস্তুর চেহারা বা ধর্ম বদলে যায় তখন বলা হয় বস্তুটির রাসায়নিক রূপান্তর ঘটেছে।

পরীক্ষা

একটা টেস্ট টিউবে কিছু তামার চোকলা ও অন্য টেস্ট টিউবে এক টুকরো কাঠ গরম করতে থাক। বেশ কিছুক্ষণ গরম করার পর দেখবে তামার চোকলার কোন পরিবর্তন হয়নি। হাত দিলে বুঝবে বেশ গরম হয়েছে। 1083°C পর্যন্ত গরম করা সম্ভব হলে তামা গলে যেত। সেটা হত ভৌত পরিবর্তন। ঠাণ্ডা করলে তামার চোকলা আগের অবস্থায় ফিরে আসবে। কাঠ কিন্তু পুড়ে ছাই-এ পরিণত হয়েছে। এটা কাঠের রাসায়নিক পরিবর্তন। আগের অবস্থায় কাঠকে ফিরে পাওয়া আর সম্ভব নয়।

প্রশ্ন

1. কোনটি ভৌত আর কোনটি রাসায়নিক পরিবর্তন?

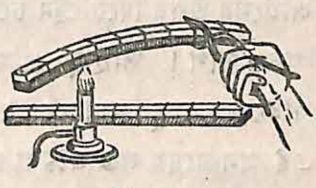
(ক) লোহায় মরচে পড়া
(খ) স্পিরিটের বাষ্পায়ন
(গ) দুধ পুড়ে যাওয়া
(ঘ) হলুদ গুঁড়ো করা
(ঙ) রান্না করা তরকারি

2. ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন কিভাবে বোঝা যায়? খাওয়ার পর পাকস্থলীতে খাবার গেলে কি ধরনের পরিবর্তন হয়?

ভৌত পরিবর্তন : গরমে প্রসারণ

তোমরা দেখেছ, অনেক সময় শিশি বোতলের ঢাকা খুব আঁট হয়ে থাকলে তাকে গরম করলে সেটা সহজেই খুলে আসে। এর কারণ সমস্ত কঠিন পদার্থ গরমে আয়তনে বাড়ে এটা পদার্থের ধর্ম। এর উদাহরণ তোমরা আরো নিশ্চয় দেখেছ।

গরমে সব ধাতুর প্রসারণ এক রকম হয় না, কোনটা বেশি বাড়ে কোনটা কম। সেইজন্য যদি একসঙ্গে তামা ও লোহার পাত জুড়ে গরম করা হয় তাহলে সেই দ্বিধাতুর ফলকটা বেঁকে যাবে (চিত্র 4.5)। সেইজন্য দুই ধাতুর পাত একসঙ্গে করে নানা কাজে লাগানো হয়। ইস্ত্রির ভিতরে এইভাবে দুই ধাতুর থার্মোস্ট্যাট লাগানো থাকে। একটা বিশেষ তাপমাত্রায় পৌঁছলে পাতটা বেঁকে যাবে ও সার্কিট বন্ধ হবে, ফলে ইস্ত্রিটা অসম্ভব রকম গরম হয়ে উঠতে পারবে না।



চিত্র 4.5

বল ও রিং পরীক্ষা : একটা ধাতব বল আর একটা লোহার রিং নিয়ে একটা পরীক্ষা করা যায় যাতে ধাতুর গরমে প্রসারণ প্রমাণ হয়। ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় বলটা ঠিক রিংএর মধ্যে দিয়ে



চিত্র 4.6

গলে যায় এমন মাপের হওয়া দরকার (চিত্র 4.6)। বলটা গরম করে নিয়ে এসো। এখন চেষ্টা করে দেখ, রিং-এর মধ্যে দিয়ে বল গলবে না। ঠাণ্ডা হলে একটু পরেই কিন্তু আবার গলে যাবে।

ফুটন্ত গরম জল হঠাৎ একটা কাচের গেলাসে ঢালো, আর একটা কাঁসার গেলাসে ঢালো। কোনটাতে কি হল? কাচের গেলাস ফেটে যাবে, তার কারণ গেলাসের কাচের ভিতর দিকটা গরমে বেড়ে গেছে, কিন্তু কাচের বাইরের দিকটা ততটা গরম হয়নি। কাচের মধ্যে দিয়ে তাপ তাড়াতাড়ি যেতে পারে না। কাচের পরিবহণ ক্ষমতা কম। কাঁসার গেলাস খুব গরম হবে, কিন্তু ফাটবে না। তার কারণ কাঁসার দুটো পিঠই সমানভাবে গরম হয়েছে, এবং প্রসারণও সমান ভাবেই হয়েছে।

রেল লাইনের মধ্যে মধ্যে যে ফাঁক দেখা যায় তার কারণ তোমরা একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে। যখন প্রচণ্ড জোরে লাইনের উপর দিয়ে ট্রেন চলে যায় তখন চাকার ঘর্ষণে উৎপন্ন হয় প্রচণ্ড তাপ। তাছাড়া গ্রীষ্মকালে যখন তাপমাত্রা খুব বাড়ে তখনও লাইনের ধাতু পদার্থের স্বাভাবিক ধর্ম অনুযায়ী প্রসারিত হবে। এই প্রসারণের জন্য জায়গা চাই। যদি লাইনের মধ্যে মধ্যে ফাঁক না থাকত তাহলে গরমে প্রসারিত হয়ে বাড়বার জায়গার অভাবে লাইন জায়গায় জায়গায় বেঁকে যেত।

বস্তু কি দিয়ে তৈরি

যে কোন একটা জিনিস ভেঙে দু-টুকরো করা যায়। যদি টুকরোগুলো ভাঙতে থাক আরও টুকরো পাবে। এইভাবে ভাঙতে ভাঙতে কোথায় গিয়ে শেষ হবে? কতক্ষণ একটা জিনিসকে ভাঙা যেতে পারে? এই প্রশ্ন বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতদের কাছে দীর্ঘদিন সমস্যা হয়ে ছিল। প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতেরা বলতেন পাঁচটি উপাদান দিয়ে পৃথিবীর যে কোন বস্তু তৈরি। এই পাঁচটি উপাদান হল ক্ষিতি (মাটি), অপ্ (জল), তেজ (আগুন), মরুৎ (বাতাস)

ও ব্যোম (আকাশ)। গ্রীস দেশের পণ্ডিত অ্যারিস্টটলের নাম তোমরা আগেই শুনেছ। তিনি বলতেন পৃথিবীর যে কোন বস্তু চারটি উপাদান দিয়ে তৈরি—পৃথিবী, বাতাস, জল ও আগুন। এই সব উপাদানের চারটি গুণ—শুকনো, স্যাঁৎসেঁতে, ঠাণ্ডা ও গরম। তাঁর মতে পৃথিবী শুকনো, বাতাস স্যাঁৎসেঁতে, জল ঠাণ্ডা, ও আগুন গরম।

এই সব দার্শনিকদের পর দীর্ঘ আড়াই হাজার বছর বস্তু কি দিয়ে তৈরি এই প্রশ্ন নিয়ে কেউ কোন কথা বলেন নি। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রবার্ট বয়েল (1627-1691) প্রথম বললেন যে গ্যাস অসংখ্য কণার সমষ্টি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জন ড্যালটন নামে ইংলণ্ডের একজন বিজ্ঞানী পরীক্ষার দ্বারা সিদ্ধান্তে এলেন যে বস্তুর সব থেকে ছোট অবস্থা হল অ্যাটম বা পরমাণু। গ্রীক ভাষায় অ্যাটমস কথার মানে যাকে আর ভাঙা যায় না। তার থেকেই অ্যাটম কথার উৎপত্তি।

জন ড্যালটন ও পরমাণু

ইংলণ্ডে ঈগলসফিল্ড নামক একটি অখ্যাত গ্রামে এক কোয়েকার পরিবারে 1766 খ্রীস্টাব্দে জন ড্যালটনের জন্ম। কোয়েকারদের ধর্মবিশ্বাস সাধারণ খ্রীস্টানদের থেকে কিছু আলাদা। কোয়েকার হওয়ার ফলে তাঁর পক্ষে অক্স-ফোর্ড বা কেমব্রিজের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া সম্ভব হয় নি, কারণ তখন কেবলমাত্র চার্চ অফ ইংলণ্ডের অনুগামীদের জন্যই ওসব জায়গার দরজা খোলা ছিল। যাই হোক, ড্যালটন ম্যানচেস্টার কলেজে



জন ড্যালটন

ভর্তি হলেন, পরে সেখানেই অধ্যাপনা ও গবেষণায় তাঁর সারা জীবন কাটে। তাঁর মৃত্যুও সেখানেই 1844 সালে। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। তাঁর ভাইকে তিনি একবার চিঠিতে লেখেন যে তাঁর মাথা কেবল ত্রিভুজ, কোণ, রাসায়নিক প্রক্রিয়া আর বৈদ্যুতিক পরীক্ষার চিন্তাতেই পূর্ণ—এর মধ্যে স্ত্রী পুত্র পরিবারের জায়গা হওয়া সম্ভব নয়।

বিজ্ঞানের নানারকম বিষয়ে উৎসাহ ছিল তাঁর। আবহবিজ্ঞান তার মধ্যে একটি। লেক অঞ্চলের পাহাড়ে পাহাড়ে তিনি নোটবই আর ব্যারোমিটার নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন—বাতাসের চাপ, আর্দ্রতা আর বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মেপে টুকে রাখতেন—এইভাবে সারা জীবনে প্রায় দুই লক্ষ পর্যবেক্ষণের নোট তাঁর খাতায় লেখা হয়েছিল। লম্বা লম্বা পা ফেলে তিনি চড়াই আর উৎরাই ওঠানামা করতেন—সঙ্গীরা কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে বলত, জন, তোর পা দুটো কিসের তৈরি?

বাতাস নিয়ে নানারকম পর্যবেক্ষণ করতে করতে ড্যালটন অ্যাটমের ধারণায় এসে পৌঁছলেন। বাতাস কি কয়েক রকম গ্যাসের মিশ্রণ না এক ধরনের যৌগ, এই নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন তিনি। মিথেন গ্যাসের সন্ধানে তিনি প্রায়ই জলা জঙ্গলে গিয়ে পচা ডোবার জল ঘাঁটাঘাঁটি করতেন, ছোট ছেলেমেয়েরা এই দেখে খুব মজা পেত। ড্যালটনের আগেই অবশ্য পরমাণু মতবাদ মোটামুটি তৈরি হয়েছিল। নিউটনও বিশ্বাস করতেন যে সমস্ত পদার্থ অতি ছোট কণার সমষ্টি। ড্যালটন ভাবতে শুরু করলেন এই অতি ছোট কণার চেহারা কেমন। নিউটনের ধারণা ছিল বাতাস একই জাতীয় পদার্থের ছোট ছোট কণার সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে। অবশ্য পরে পরীক্ষা থেকে প্রমাণ হয়েছে যে বাতাস অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের সমবায়ে তৈরি। ড্যালটন ভাবলেন তাহলে অক্সিজেনের নিচে নেমে আসা উচিত, যদি না কোন রাসায়নিক উপায়ে এটা নাইট্রোজেনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। এখানে একটা

কথা মনে রাখা দরকার। এখন আমরা জানি পদার্থের এই সব কণাগুলো সর্বদা নড়াচড়া করছে—কিন্তু সেই সময় মনে করা হত এই কণাগুলো স্থির। যাই হোক ড্যালটন পরমাণুর একটা চেহারা কল্পনা করে বৃত্ত আঁকলেন। তার থেকে সূর্যরশ্মির মত লাইন বেরিয়েছে। সেগুলি হল পরমাণু থেকে বিকীর্ণ তাপ। এর আগেই বিজ্ঞানী লাভয়সিয়ে দেখিয়েছিলেন যে বাতাসে চার ভাগ নাইট্রোজেন, এক ভাগ অক্সিজেন। ড্যালটন অনুমান করলেন যে গ্যাসের আয়তনের সঙ্গে প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের অ্যাটমের সংখ্যার কোন একটা সম্পর্ক আছে। গ্যাসের ধর্মের সঙ্গে মৌল কণাদের ধর্মের যোগ আছে কিনা তাই নিয়ে তিনি পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। এইজন্য বলা হয় অ্যাটমিক মতবাদের জন্মদাতা জন ড্যালটন। যদিও তাঁর আগে অ্যাটম নিয়ে অনেকেই চিন্তা করেছেন, কিন্তু সেগুলো ছিল অনেকটা ভাসা ভাসা ধরনের। ড্যালটনই প্রথম অ্যাটম নিয়ে হাতে নাতে পরীক্ষা করেন, এমন কি অ্যাটম ওজন করার একটা পদ্ধতিও বার করেন।

আভোগাড্রো ও মলিকিউল

আমরা যে সমস্ত বস্তু দেখি তার কতকগুলি মৌল ও কতকগুলি যৌগ এ কথা তোমরা আগেই পড়েছ। মৌলগুলিতে বস্তুর উপাদান এক জাতীয়। যৌগ তৈরি হয় বিভিন্ন মৌল দিয়ে। ড্যালটন অ্যাটমবাদ প্রয়োগ করতে গিয়ে একটু মুশকিলে পড়েছিলেন। মৌল ও যৌগের ক্ষুদ্রতম অংশকে কি অ্যাটম বলা হবে? এই সমস্যার ভাল সমাধান ড্যালটন করতে পারেন নি। তিনি বলেছিলেন মৌলগুলির ক্ষুদ্রতম অংশ হবে সহজ অ্যাটম ও যৌগদের জটিল অ্যাটম। এই সমস্যার সমাধান করেন ইতালীর আমেদিও আভোগাড্রো। তাঁর মতে মৌলের ক্ষুদ্রতম অংশ মলিকিউল। মলিকিউলকে বাংলায় অণু বলা হয়। অ্যাটম পরমাণু, মলিকিউল অণু। বিভিন্ন মৌলের পরমাণু জুড়ে যৌগের অণু তৈরি হয়।

আবার একই মৌলের একাধিক পরমাণু জুড়ে যৌগের অণু তৈরি হয়ে থাকে। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অণুতে দুটি পরমাণু থাকে। আবার অনেক গ্যাস আছে যাদের অণুতে একটিই পরমাণু থাকে, নিয়ন, হিলিয়ম এই জাতীয় উদাহরণ।

আমেদিও আভোগাদ্রের জন্ম হয় 1776 খ্রীস্টাব্দে, ইতালীর তুরিনে। মৃত্যুও হয় সেখানে, 1856 খ্রীস্টাব্দে। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপক ছিলেন অনেক বছর। প্রথমে পদার্থ-বিদ্যা ও পরে গাণিতিক পদার্থবিদ্যা পড়াতেন। আভোগাদ্রো সূত্রের আবিষ্কর্তা হিসেবে তিনি বিখ্যাত। এই সূত্রে বলা হয়েছে একই তাপ ও চাপে সম আয়তনের গ্যাসে একই সংখ্যক মলিকিউল থাকে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আভোগাদ্রোর এই প্রয়োজনীয় আবিষ্কারটির প্রতি কেউ গুরুত্ব দেয় নি। তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে এই সূত্র স্বীকৃত হয়েছিল। বিজ্ঞানের কোন সূত্র বা তত্ত্ব আবিষ্কার হলেও সেই সময়কার বিজ্ঞানীরা তার মর্ম বুঝতে পারেন নি, এরকম ঘটনা বিজ্ঞানের ইতিহাসে অনেকবার হয়েছে।

প্রশ্ন

1. বস্তু বলতে কি বোঝায়? জড় ও জীবে পার্থক্য কি? জড়তা কাকে বলে? বস্তুর ধর্ম কাকে বলে? ধর্মগুলি সম্বন্ধে যা জান লেখ।

2. বস্তুর অবস্থা কাকে বলে? কয়টি অবস্থা আছে? পরীক্ষার সাহায্যে বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন বর্ণনা কর। গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক কাকে বলে? গলন ও স্ফুটন, হিমায়ন ও ঘনীভবন কাকে বলে? গলনের সঙ্গে হিমায়নের এবং স্ফুটনের সঙ্গে ঘনীভবনের প্রভেদ কি?

2. ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম কাকে বলে? উদাহরণসহ ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা কর।

4. তাপমাত্রার প্রভাবে বস্তুর প্রসারণ কি ভাবে ঘটে? পরীক্ষার সাহায্যে বস্তুর প্রসারণ ব্যাখ্যা কর।

6. ড্যালটন কে ছিলেন ? তাঁর পরমাণুবাদ সম্বন্ধে যা জান লেখ। আভোগাড্রো কি ভাবে ড্যালটনের পরমাণুবাদের ব্যাখ্যা করেছিলেন ?

7. শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

(ক) যা আমাদের — কাছে ধরা দেয়, যারা কিছু — অধিকার করে এবং যাদের — আছে, তাদের — বলে।

(খ) যে সব — প্রাণ আছে তাদের বলে — আর যাদের প্রাণ নেই তাদের বলে —।

8. কাকে বলে ? (৩/৪ লাইনে উত্তর দাও)

(ক) জড়তা

(খ) সংকোচনশীলতা

(গ) অভেদ্যতা

(ঘ) বস্তুর ভর

(ঙ) বস্তুর ভার

(চ) ঘনাঙ্ক

9. কোন্ কোন্ ধর্মের সাহায্যে বস্তুকে সনাক্ত করা হয় ? ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের মধ্যে পার্থক্য কি ? আমাদের চারপাশে অনবরত রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে চলেছে। কয়েকটি উদাহরণ দাও।

10. নিচের কোনটি ভৌত এবং কোনটি রাসায়নিক পরিবর্তন ?

(ক) এক টুকরো কাগজ পোড়ান হল।

(খ) এক গেলাস দুধ বাইরে কয়েকদিন রাখা হলে দুধ জমে যায়।

(গ) এক টুকরো রুটি সেঁকার সময় পুড়ে কালো হয়ে গেল।

(ঘ) চুনে জল ঢালা হল।

(ঙ) চিনি পোড়ান হল।

(চ) লোহার টুকরোয় মরচে পড়া।

(ছ) জলের বরফে পরিণত হওয়া।

(জ) লোহার পাত গরম করায় বৃদ্ধি পায়।

(ঝ) চুম্বক গরম করায় চুম্বকত্ব নষ্ট হয়

(ঞ) বাতাসে প্রদীপ জ্বলতে থাকা।

11. বাঁদিকের বাক্যাংশের সঙ্গে ডান দিকের বাক্যাংশ যোগ করে অর্থবোধক বাক্য গঠন কর :

(ক) স্ফুটনাঙ্ক বলে (*i*) বস্তুর ভৌত ধর্মের পরিবর্তনকে

(খ) গলনাঙ্ক বলে (*ii*) তরলকে ঠাণ্ডা করে কঠিনে পরিণত করাকে

(গ) রাসায়নিক ধর্ম বলে (*iii*) বস্তুর রাসায়নিক পরিবর্তনকে

(ঘ) গলন বলে (*iv*) কঠিনের তরলে পরিণত হওয়াকে

(ঙ) হিমায়ন বলে (*v*) বস্তুর রাসায়নিক উপাদান ও রাসায়নিক বিক্রিয়া সংক্রান্ত ধর্মকে

(চ) ভৌত পরিবর্তন বলে (*vi*) যে তাপমাত্রায় কঠিন তরলে পরিণত হয়

(ছ) রাসায়নিক পরিবর্তন বলে (*vii*) তরল যে তাপমাত্রায় গ্যাসে পরিণত হয়

12. কোন বস্তু তরল, কঠিন না গ্যাস নির্ভর করে তার

(*a*) আয়তনের উপর

(*b*) তাপমাত্রার উপর

(*c*) অবস্থানের উপর

সঠিক উত্তরে দাগ দাও।

13. কাঠের গলনাঙ্ক কত ?

14. শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

(ক) একই মৌলের পরমাণু—

(খ) বিভিন্ন মৌলের পরমাণু—

(গ) মৌলের — একই ধরনের — আছে কিন্তু — অণুতে — ধরনের — আছে।

15. ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের মধ্যে পার্থক্য কি ?

(ক) যখন খাবার পাকস্থলীতে আসে তখন কোন ধরনের পরিবর্তন ঘটে ?

(খ) দুধ পুড়লে কি পরিবর্তন হয় ?

(গ) হলুদ গুঁড়ো করলে কি পরিবর্তন হয় ?

(ঘ) কর্পূর উবে গেলে কি পরিবর্তন হয় ?

(ঙ) খাবার রান্না করলে কি পরিবর্তন হয় ?

16. ভুল শব্দটি কেটে দাও :

(ক) যখন হাতের চেটোয় কোন তরল বাষ্পায়িত হয় তখন হাতের চেটো ঠাণ্ডা/গরম হয়।

(খ) স্টীমকে (গরম/ঠাণ্ডা) করলে জল হয়।

17. (ক) পিরিচে গরম চা ঢেলে ফুঁ দিলে তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয় কেন ?

(খ) ফুটন্ত গরম জল কাচের গেলাসে ঢাললে গেলাস ফাটে কেন ?

(গ) রেল লাইনের মাঝে মাঝে ফাঁক রাখা হয় কেন ?

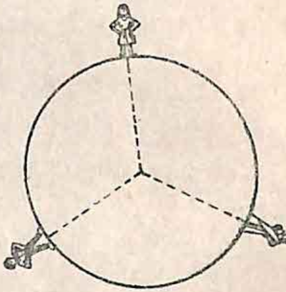
18. সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :

সংকোচনশীলতা, অভেদ্যতা, ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন, অণু ও পরমাণু, জন ড্যালটন, আভোগাড্রো।

৫ মহাকর্ষ

স্থিতি ও গতি

চারপাশে তাকালে দেখা যাবে অনেক জিনিস সচল, আবার অনেক জিনিস এক জায়গায় স্থির। বাস চলে, নৌকো চলে, কুকুর দৌড়য়, আমরা হাঁটা চলা করি। ইট, পাথর, লোহা এক জায়গায় পড়ে থাকে। গাছও দাঁড়িয়ে থাকে, জায়গা পরিবর্তন করে না। যা যা চলে, ছোটে বা হাঁটে তারা পাশের কোন একটি বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করে। বলা হয় এরা গতিতে আছে। তুমি যখন পথ দিয়ে হেঁটে যাও তখন সহজেই বুঝতে পারো দু-পাশের বাড়িগুলোর থেকে তোমার দূরত্ব ক্রমে বাড়ছে বা কমছে—অর্থাৎ তাদের সঙ্গে তোমার অবস্থানের পরিবর্তন হচ্ছে। টেবিলে পেনসিল রেখে দাও। আশপাশের জিনিসের পরিপ্রেক্ষিতে সে তার অবস্থানের পরিবর্তন করে না। এই অবস্থায় বলা হয় বস্তুটি **স্থিতিতে** আছে। সুতরাং বস্তু গতিতে থাকলে পাশের অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে তার অবস্থানের পরিবর্তন ঘটবে কিন্তু স্থিতিতে থাকলে অবস্থানের কোন পরিবর্তন হবে না।



চিত্র 5.1

পৃথিবী সকল বস্তুকে টানে

উঁচু থেকে একটা ঢিল ফেললে সেটা মাটিতে এসে পড়ে। উঁচু জায়গা থেকে তোমরাও কত মাটিতে আছাড় খেয়েছ। ছাদে পাঁচিল না থাকলে পড়ে যাবার ভয় থাকে। এমন হবার কারণ যে কোন বস্তুকে পৃথিবী নিচের দিকে টানে। এটা শুধু আমরা

যেখানে আছি সেখানেই ঘটছে না, ভূপৃষ্ঠের যে কোন স্থানেই সকল বস্তুকে পৃথিবী এইভাবে টেনে রেখেছে। যে কোন জায়গার এই আকর্ষণী বলকে যদি সরল রেখার আকারে বাড়িয়ে যাও দেখবে রেখাগুলি সব পৃথিবীর কেন্দ্রে এসে মিলিত হয়েছে (চিত্র 5.1)। তার মানে আমাদের পায়ের তলায় মাটি না থাকলে আমরা একেবারে শো করে পৃথিবীর কেন্দ্রে হাজির হতাম।

পৃথিবী যে সকল বস্তুকে তার কেন্দ্রের দিকে টানে এই স্বাভাবিক সত্যটি আবিষ্কৃত হতে কিন্তু অনেক দিন লেগে গিয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নিউটন এই সূত্রের কথা প্রথম বলেন। এই সময় পর্যন্ত বিজ্ঞানে নানা দিকে নানা রকম আবিষ্কার ঘটে, কিন্তু সেগুলোর মধ্যে কোন সম্বন্ধ ছিল না। সেগুলো ছিল বিক্ষিপ্ত। দরকার ছিল এমন একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির যিনি এই সমস্ত তথ্যগুলি একসঙ্গে গেঁথে একটা সমন্বয় সাধন করেন। কেপলারের গ্রহগতি সম্পর্কিত সূত্রের কথা তোমরা পরের অধ্যায়ে পড়বে। নিউটনই প্রথম দেখান যে তারা একটিই প্রাকৃতিক নিয়ম থেকে উদ্ভূত। সেই নিয়ম হল, বিশ্বজগতে প্রতিটি বস্তু প্রতিটি বস্তুকে টানছে। এবং এই নিয়মে কেবল গ্রহগতি কেন, গ্যালিলিওর পেণ্ডুলাম, জোয়ার-ভাটা ইত্যাদি নানা ঘটনার ব্যাখ্যা সম্ভব।

যে বছর গ্যালিলিও মারা যান সে বছর নিউটনের জন্ম, 1642 খ্রীস্টাব্দে। ইংলণ্ডের লিংকনশায়ারে। বাবা চাষবাস করতেন। ছোটবেলায় নিউটনের প্রতিভার খুব একটা লক্ষণ দেখা যায় নি। কেমব্রিজে পড়ার সময় থেকে তিনি আধুনিক বিজ্ঞান নিয়ে ভালভাবে চর্চা আরম্ভ করলেন। কেপলারের লেখা পড়ে ফেললেন। 1665 সালে প্লেগ মহামারীর জন্য কলেজ বন্ধ হয়ে যায়, নিউটন সেই সময়টা গ্রামে চলে যান। গল্প আছে এই সময় একদিন আপেল গাছের তলায় বসে থাকার সময় একটি আপেলকে তিনি মাটিতে পড়তে দেখেন। তখন তাঁর মনে পৃথিবীর আকর্ষণের কথাটা উদয় হল। তাঁর মনে হল পৃথিবীর আকর্ষণের মত গ্রহ, উপগ্রহ, সূর্য

ইত্যাদি সকলেই একে অন্যকে টানছে। এই আকর্ষণের জন্যই গ্রহেরা সূর্যের চারপাশে এবং উপগ্রহেরা গ্রহের চারপাশে ঘুরছে। তিনি বললেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে কোন দুটি বস্তু—যত বড় বা যত ছোট হোক না কেন—একে অন্যকে আকর্ষণ করে। 1662 সালে রাজা দ্বিতীয় চার্লস রয়াল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হত। রয়াল সোসাইটির কয়েকজন সদস্য নিউটনকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন—কেপলারের সূত্র ও পৃথিবীর টানের মধ্যে কোন সম্বন্ধ আছে কিনা বার করতে। তারই ফলে তাঁর 'প্রিনসিপিয়া' নামক বইটি রচিত হয়। এতে তিনি দেখান গ্রহদের কক্ষপথ থেকে তরল পদার্থের ধর্ম, ধূমকেতু, চলন্ত বস্তুর প্রকৃতি ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় একই প্রাকৃতিক নিয়মের আওতায় পড়ছে।



নিউটন

1669 খ্রীস্টাব্দে নিউটন গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অনেক সম্মানে ভূষিত হন তিনি। পঁচিশ বছর তিনি রয়াল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন, সার উপাধিও পান। ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবিতে তাঁকে উপযুক্ত সম্মানের সঙ্গে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁকে সম্মান দেওয়ার অর্থ বিজ্ঞানকেই উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া।

মহাকর্ষ

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধূলিকণা থেকে আরম্ভ করে গ্রহ তারা যে কোন দুটি বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণী বলকে বলে **মহাকর্ষ** বা গ্র্যাভিটেশন। পরীক্ষা করে এই সূত্র প্রমাণও হয়েছে। মহাকর্ষ

বস্তুর অবস্থান বা মাধ্যমের উপর নির্ভর করে না। মহাকর্ষ নির্ভর করে বস্তুর ভর ও বস্তু দুটির কেন্দ্রের মধ্যের দূরত্বের উপর। বস্তু দুটির ভর বাড়লে মহাকর্ষের মান বাড়ে এবং বস্তু দুটির কেন্দ্রের মধ্যের দূরত্বের বর্গ অনুযায়ী মহাকর্ষের মান কমে। ভর কথাটি তোমাদের কাছে নতুন লাগছে। কোন বস্তুতে পদার্থের মোট পরিমাণকে বস্তুর ভর বা ম্যাস বলে। তবে এর সঙ্গে আর একটি কথা শিখে রাখ—ভার। বস্তুর ওজনকে তার ভার বলে। দোকানে দাঁড়ি পাল্লায় ওজন মাপা হয়। গবেষণাগারে সূক্ষ্ম ওজন নেওয়ার প্রয়োজন হয়। সূক্ষ্ম ওজন নেওয়ার যন্ত্রের নাম ফিজিকাল ব্যালান্স। এছাড়া ওজন নেওয়ার আর এক ধরনের যন্ত্র আছে যার নাম স্প্রিং তুলা বা স্প্রিং ব্যালান্স। বস্তুর ওজন বা ভার বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণের পরিমাপ। ভারি বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণ বেশি, তাই তার ওজন বেশি।

অভিকর্ষ

পৃথিবীর মহাকর্ষকে বলে **অভিকর্ষ** বা ইংরেজীতে গ্র্যাভিটি। পৃথিবীর উপর অবস্থিত বা পৃথিবীর কাছে কোন বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণকে অভিকর্ষ বলে। অভিকর্ষ মহাকর্ষেরই একটি বিশেষ রূপ, কেবল পৃথিবীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পৃথিবী যখন কোন বস্তুকে টানছে, বস্তুটিও পৃথিবীকে টানছে একই বল দিয়ে। কিন্তু পৃথিবী অনেক ভারি তাই বস্তুটিই আকর্ষণের জন্য পৃথিবীর দিকে এগিয়ে যায়।

ভেবে দেখ যদি পৃথিবীর অভিকর্ষ না থাকত তবে কি হত। পৃথিবী কোন বস্তুকেই আকর্ষণ করত না, সেক্ষেত্রে চলাফেরা বা কোন কাজই সম্ভব হত না। সমস্ত বস্তু এলোমেলো ভাবে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াত। খেলার মাঠে হেড করার জন্য লাফ দিলে, আর মাটিতে নামতে পারলে না। খাবার সময় হাত বাড়ালে, কিন্তু থালা কোথায় ভেসে চলে গেল।

মহাকর্ষ ও অভিকর্ষের কথা পড়লে। মহাকর্ষ সূত্রের সাহায্যে সে যুগের বিজ্ঞানীরা নতুন গ্রহ আবিষ্কার করেছিলেন। অনেক দিন ধরেই ইউরেনিয়স গ্রহের কক্ষপথ নিয়ে জ্যোতির্বিদরা একটু ধাঁধায় পড়েছিলেন। মহাকর্ষ নিয়ম মেনে চললে ইউরেনিয়সের কক্ষপথ যা হওয়া উচিত ছিল আসল গতিপথ তার থেকে একটু আলাদা। লেভেরিয়ার নামে একজন জ্যোতির্বিদ বললেন ইউরেনিয়সের ওপাশে নিশ্চয় কোন অজানা গ্রহ আছে যার আকর্ষণে সে নির্দিষ্ট গতিপথ থেকে বিচ্যুত হচ্ছে। 1846 খ্রীস্টাব্দে যোহান গোডফ্রিড গ্যালে নামক একজন জার্মান জ্যোতির্বিদ এই অজানা গ্রহ আবিষ্কার করেন—নাম নেপচুন। প্লুটো গ্রহের আবিষ্কারও ঠিক একই ভাবে ঘটেছিল।

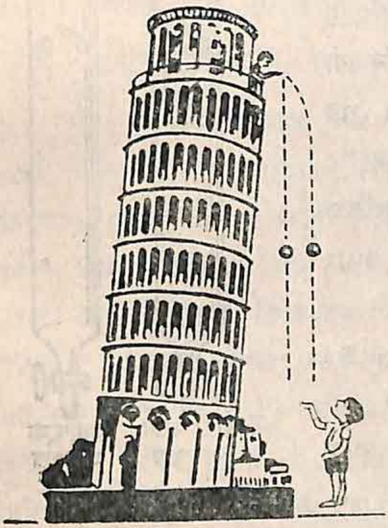
পড়ন্ত বস্তু

কোন বস্তুকে উপর থেকে ছেড়ে দিলে অভিকর্ষের জন্য পৃথিবীর উপর এসে পড়বে। বস্তু যে বেগে পৃথিবীর উপর এসে পড়ে সেই বেগ বস্তুর ভর বা কোন মাধ্যমের উপর নির্ভর করে না, কেবলমাত্র পৃথিবীর ভর ও পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে বস্তুর কেন্দ্রের দূরত্বের উপর নির্ভর করে। কিন্তু যে কোন উচ্চতা থেকে এক টুকরো কাগজ ও একটা লোহার বল যদি ছেড়ে দাও দেখবে ভারি লোহার বলটা আগে মাটিতে পড়ে। কারণ বাতাসের প্রতিরোধ বা বাধা। যে কোন পড়ন্ত বস্তুকে বাতাস বাধা দেয়। বস্তু নিচের দিকে পড়ে তার ওজনের জন্য একটি নির্দিষ্ট বেগে। বাতাসের জন্য এই বেগ বাধা পায় ও এক **অন্তিম বেগ** বা টারমিনাল ভেলসিটি নিয়ে নিচের দিকে নামে। এই অন্তিম বেগ বস্তুর বেগ ও বাতাসের প্রতিরোধের অন্তর ফল। বাতাসের প্রতিরোধ নির্ভর বরে বস্তুর আকারের উপর। আকার বড় হলে প্রতিরোধ বেশি, কম হলে প্রতিরোধ কম। হালকা বস্তুর আকৃতি যদি বড় হয় তবে বাতাসের প্রতিরোধ বেশি হবে এবং অন্তিম বেগ কম হবে।

সে ক্ষেত্রে হালকা বস্তু পরে পড়বে। কিন্তু বাতাসের প্রতিরোধ যদি উভয় ক্ষেত্রে সমান হয় তবে বস্তু দুটি একসঙ্গে নিচে এসে পড়বে।

উপরের পরীক্ষায় কাগজটা লোহার টুকরোর পরে মাটিতে এসে পড়বে। কিন্তু কাগজটাকে যদি দলা পাকিয়ে লোহার টুকরোর মত আকৃতি দিতে পার দেখবে দুটো একসঙ্গেই নিচের দিকে নামবে।

প্রাচীন গ্রীসে আরিস্টটল নামে এক দার্শনিক বলেছিলেন ভারি বস্তু তাড়াতাড়ি নিচের দিকে পড়ে। কয়েক শতাব্দী ধরে তাঁর এই মতবাদের বিরোধিতা কেউ করেনি। ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে ইতালির বিজ্ঞানী গ্যালিলিও প্রথম এই মতবাদের বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন বাতাসের প্রতিরোধ না থাকলে সকল বস্তুই একসঙ্গে মাটিতে এসে পড়বে। তিনি বিভিন্ন ওজনের কিন্তু সমান আকারের কয়েকটি ধাতুর গোলক নেন ও পিসার হেলান মিনারের উপর থেকে নিচে ফেলে দেন (চিত্র 5.2)। গোলকগুলির আকার সমান হওয়ায় বাতাসের প্রতিরোধও সমান। সেইজন্য গোলকগুলি একই সঙ্গে মাটিতে এসে পড়েছিল। গ্যালিলিও বলেন যে যদি বাতাসের প্রতিরোধ সম্পূর্ণরূপে দূর করা যায় তবে বস্তুর আকৃতি যাই হোক না কেন সব বস্তু একই সময়ে মাটিতে এসে পড়বে। গ্যালিলিওর সময়ে হাওয়া বার করে নিয়ে শূন্যস্থান সৃষ্টি করার সুযোগ ছিল না কারণ তখন বায়ু নিষ্কাশন যন্ত্র আবিষ্কার হয়নি।

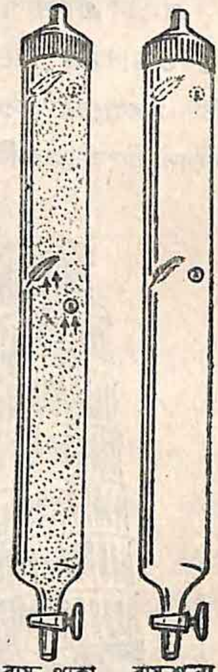


চিত্র 5.2

গিনি ও পালক পরীক্ষা

গ্যালিলিওর এই অনুমানকে পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেন বিজ্ঞানী নিউটন। তাঁর এই পরীক্ষা গিনি ও পালকের পরীক্ষা নামে বিখ্যাত।

একটা প্রায় এক মিটার লম্বা কাচের নল নেওয়া হল যার একদিক বন্ধ করা যায় ও অন্যদিকে একটি স্টপকক লাগানো আছে (চিত্র 5.3)। নলের ভিতর একটা গিনি ও একটা পালক নেওয়া হল। নলটা হঠাৎ উলটিয়ে দিলে দেখা যাবে গিনিটা পালকের অনেক আগে এসে পড়েছে। এইবার স্টপকক খুলে বায়ু নিষ্কাশন যন্ত্রের সঙ্গে লাগিয়ে ভিতরের বাতাস বার করে নেওয়া হল। বাতাস বার করে নেওয়ার পর স্টপকক বন্ধ করে দেওয়া হল। নলের ভিতর এখন সম্পূর্ণ না হলেও আংশিক ভাবে বায়ুশূন্য। এখন নলটা হঠাৎ উলটিয়ে দিলে দেখা যাবে গিনি ও পালক একই সঙ্গে এসে পড়ছে। শূন্যস্থানে বাতাসের প্রতিরোধ না থাকায় গিনি ও পালক একই সঙ্গে নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করেছে।



চিত্র 5.3

নিজে কর

তোমরা নিজেও এই পরীক্ষাটা করতে পার। একটা আধুলি বা একটা গোল খোলামকুচি জোগাড় কর। এক টুকরো কাগজ গোল করে আধুলি বা খোলামকুচির আকারে কেটে নাও। কাগজ ও খোলামকুচি পাশাপাশি একটু উঁচু থেকে ছেড়ে দাও। দেখবে কাগজের টুকরোটা খোলামকুচির অনেক পরে মাটিতে এসে পড়ল। এইবার কাগজটার উপরে

খোলামকুচিটা রেখে একই উচ্চতা থেকে ছেড়ে দাও। কি দেখলে? কাগজ ও খোলামকুচি একই সঙ্গে মাটিতে পড়ল। কারণ উভয়ের উপর প্রতিরোধ সমান।

অভিকর্ষজ ত্বরণ

মহাকর্ষ থাকার জন্য পৃথিবীর যে টান আমাদের প্রত্যেকের উপর আছে এবং পড়ন্ত বস্তুর গতি ত্বরিত করছে তার নাম অভিকর্ষ। টান শুধু যে পৃথিবীতে আছে তা নয়, অন্য গ্রহে, উপগ্রহে, চাঁদে, তারায় সূর্যে আছে। সব জায়গায় কিন্তু এই টান একরকম নয়। কোন গ্রহ বা উপগ্রহের পৃষ্ঠে আকর্ষণী বলের মান নির্ভর করে আকর্ষণকারী বস্তুর ভরের উপর এবং বিপরীত ভাবে তার ব্যাসার্ধের বর্গের উপর। অর্থাৎ ভর m ও ব্যাসার্ধ r হলে আকর্ষণী বল হবে $-\frac{m}{r^2}$। চাঁদের আকর্ষণী বল পৃথিবীর আকর্ষণী বলের চেয়ে ছয় গুণ কম। পৃথিবীতে যার ওজন 60 kg, চাঁদে গেলে তার ওজন হবে 10 kg, আবার বৃহস্পতিতে গেলে 150 kg, কারণ বৃহস্পতিতে এই বলের মান আড়াই গুণ বেশি। চাঁদে গেলে শরীর অত্যন্ত হালকা মনে হবে, নদী নালা সহজেই লাফ দিয়ে পেরোন যাবে। সূর্যে কিন্তু ঠিক তার উলটো। সূর্যের আকর্ষণী বল পৃথিবীর আকর্ষণী বলের চেয়ে 27 গুণ বেশি। সুতরাং পৃথিবীর 1 kg ওজন সূর্যে হবে 27 kg এবং 60 kg ওজনের মানুষটি সূর্যে গিয়ে হবে 1,620 kg!

পৃথিবী তার বায়ুমণ্ডলকে ধরে রেখেছে তার আকর্ষণের জোরে। যদি পৃথিবীর আকর্ষণী বল এই বায়ুমণ্ডলকে ধরে রাখার পক্ষে যথেষ্ট না হত তবে বায়ুমণ্ডল থাকত না। চাঁদের আকর্ষণী বল কম হওয়ায় চাঁদের কোন বায়ুমণ্ডল নেই।

জোয়ার-ভাটা

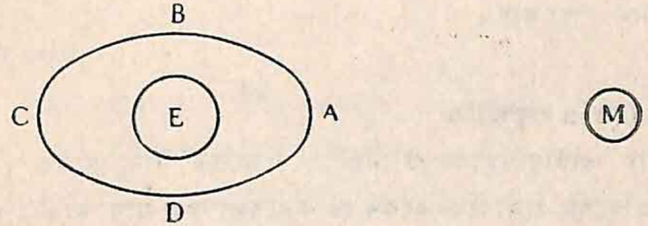
সমুদ্রের ধারে বা সমুদ্রের কাছাকাছি নদীর ধারে যারা থাকে তারা

নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ সমুদ্রের উপকূলে মাঝে মাঝে জল উছলে ওঠে। তখন দুকূল ভেসে যায়। একে বলে **জোয়ার**। জোয়ার আসার আগে নৌকোর বাঁধন খুলে দেওয়া হয় নয়ত নৌকো ডুবে যাবার ভয় থাকে। আবার জল কখনো কখনো কমে যায়। তাকে বলে **ভাটা**। ভাটার সময় জল সরে যাওয়ায় নৌকোগুলো মাটির উপর পড়ে থাকে। কলকাতা থেকে কিছু দূরে বঙ্গোপসাগরের মুখে একটি দ্বীপ আছে সাগরদ্বীপ। সাগরদ্বীপে যাবার জন্য সেখানকার লোকেরা ভাটার জন্য অপেক্ষা করে। ভাটার টান নৌকোগুলোকে দ্বীপে যেতে সাহায্য করে, আবার দ্বীপ থেকে ফেরার সময় তারা জোয়ারের টানে আসে। পোতাশ্রয়গুলিতে কাজ করার সময় জোয়ার-ভাটার সাহায্য নেওয়া হয়। নাবিকদের জোয়ার ভাটার সময় জানা খুবই দরকার। জোয়ার ভাটার সময় অত্যন্ত সঠিক ভাবে জানা সম্ভব।

প্রাচীন চীনে লোকে বিশ্বাস করত পৃথিবীতে এক বিরাট দৈত্য বাস করে যার নিশ্বাসের সঙ্গে সমুদ্রের জল বাড়ে কমে। পশ্চিম ইউরোপের লোকেদের মধ্যে ধারণা ছিল আকাশের দেবতাদের কাজ সমুদ্রে কেবল ফুঁ দেওয়া—এই জন্যেই জোয়ার ভাটা দেখা দেয়।

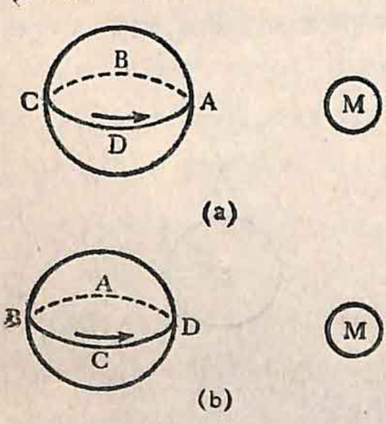
জোয়ার ভাটার প্রধান কারণ মহাকর্ষ বল। চন্দ্র সূর্য থেকে আরম্ভ করে সমস্ত জাগতিক বস্তুই পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। কিন্তু চাঁদ ও সূর্যের তুলনায় তাদের আকর্ষণ খুবই কম। নিউটনের মহাকর্ষ নিয়ম অনুসারে প্রত্যেকটি বস্তুর আকর্ষণ তাদের ভরের গুণফলের সমানুপাতিক ও দূরত্বের বর্গের ব্যাস্তানুপাতিক। সূর্যের ভর পৃথিবীর চেয়ে 333×10^3 গুণ বেশি কিন্তু পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব চাঁদ ও পৃথিবীর দূরত্বের তুলনায় প্রায় 400 গুণ বেশি। সূর্যের দূরত্ব $14 \cdot 99 \times 10^7$ কিলোমিটার ও চাঁদের দূরত্ব $3 \cdot 84 \times 10^5$ কিলোমিটার, সেজন্য পৃথিবীর উপর সূর্যের টান চাঁদের তুলনায় অনেক কম।

মনে কর চাঁদের অবস্থান M ও পৃথিবীর অবস্থান E (চিত্র 5.4)। চাঁদের টানে A স্থানের জল ফুলে উঠেছে, ফলে B ও C স্থানের জল A স্থানে এসে জমা হয়েছে। A স্থানে এখন জোয়ার এবং B ও C স্থানে এখন ভাটা। A স্থানে যখন জোয়ার তখন পৃথিবীর বিপরীত দিকে D স্থানেও একই সঙ্গে জোয়ার দেখা দেয়। অনুমান করা হয় যে চাঁদের আকর্ষণে পৃথিবীর কঠিন অংশ বা লিথোস্ফিয়ার চাঁদের দিকে এগিয়ে আসে। ফলে D অংশেও জলস্ফীতি বা জোয়ার দেখা যায়।



চিত্র 5.4

পৃথিবী তার অক্ষের চারপাশে প্রায় 24 ঘণ্টায় একবার ঘোরে। কিন্তু প্রতিদিন আকাশে চাঁদ দেখা যায় 24 ঘণ্টা 50 মিনিট অন্তর। পৃথিবীর আহ্নিকগতির জন্য চাঁদকে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশের উপর 24 ঘণ্টায় দেখা উচিত। কিন্তু চাঁদও তখন পৃথিবীকে পরিক্রমা করতে করতে কিছু দূর এগিয়ে গিয়েছে। সেইজন্য আকাশে চাঁদ ওঠার সময়ের ব্যবধান 24 ঘণ্টা 50 মিনিট। এই সময়কে বলে **চান্দ্র** দিন।



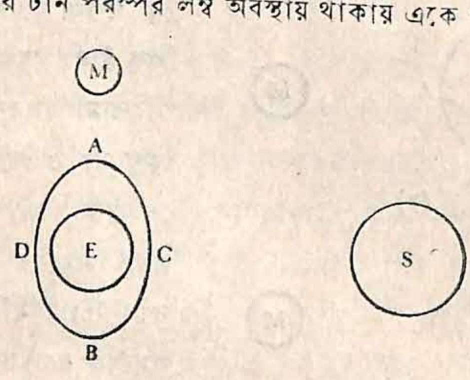
চিত্র 5.5

মনে কর কোন এক সময়ে চাঁদের অবস্থান পৃথিবীর A বিন্দুর ঠিক উপরে (চিত্র 5.5a)। তখন A ও C স্থানে

জোয়ার এবং B ও D স্থানে ভাটা। চান্দ্র দিনের সিকি ভাগ সময় পরে অর্থাৎ 6 ঘণ্টা $12\frac{1}{2}$ মিনিট পরে D স্থানটি চাঁদের ঠিক নিচে আসবে (চিত্র 5.5b)। তখন B ও D স্থানে জোয়ার এবং A ও C স্থানে ভাটা। আবার চান্দ্র দিনের সিকি ভাগ সময় পরে C ও A স্থানে জোয়ার এবং B ও D স্থানে ভাটা হবে। আরও ছয় ঘণ্টা সাড়ে বারো মিনিট পরে একটা পুরো দিন শেষ হবে। তখন A ও C স্থানে জোয়ার এবং B ও C স্থানে ভাটা দেখা দেবে। তাহলে বুঝতে পারছ জোয়ার ও ভাটা কিভাবে পরপর নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে দেখা যায়।

গুরুস্ফীতি ও লঘুস্ফীতি

জোয়ার ভাটায় সূর্যের টানের চেয়ে চন্দ্রের টান অনেক বেশি হলেও সূর্যের প্রভাবকে একেবারে অবহেলা করা যায় না। চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী একই সরল রেখায় থাকে অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিনে। তখন চাঁদ ও সূর্য উভয়ের যুক্ত টানে অন্য দিনের চেয়ে বেশি জোয়ার ওঠে। একে বলে **গুরুস্ফীতি** বা স্প্রিং টাইড। কিন্তু অষ্টমীর দিনে সূর্য ও চন্দ্র পৃথিবীর সঙ্গে সমকোণে থাকে (চিত্র 5.6)। তখন চাঁদ ও সূর্যের টান পরস্পর লম্ব অবস্থায় থাকায় একে অন্যের টানকে



চিত্র 5.6

কমায়। যেমন ধর চাঁদের টানে A ও B স্থানে জোয়ার এবং C ও D স্থানে ভাটা দেখা যায়। কিন্তু সূর্যের টানে C ও D স্থানে

জোয়ার এবং A ও B স্থানে ভাটা দেখা যাবে। এই দুই টানের প্রভাবে জোয়ার খুব কম হবে। একে বলে **লঘুস্ফীতি** বা নীপ টাইড।

জোয়ার ভাটার সময় জলের বেগ প্রচণ্ড হয়। কোন নৌকো বা জাহাজ বেকায়দায় থাকলে ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে পারে। জোয়ার ভাটার শক্তি কাজে লাগিয়ে অনেক দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়ে থাকে। তবে আমাদের দেশে এখনও এ ধরনের কোন প্রকল্প নেই।

পৃথিবী ছাড়িয়ে

1865 সালে জুল ভার্ন চাঁদে যাওয়ার কল্পনা করে একটি বই লেখেন, তাতে একটি অ্যালুমিনিয়মের ফাঁপা গোলাকে কামানে করে ছুঁড়ে চাঁদে পাঠান হয়েছিল। এঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত কয়েকটি মারাত্মক ভুল থাকলেও জুল ভার্ন কিন্তু আসল সমস্যাটা ধরতে পেরেছিলেন। এক্ষেত্রে আসল প্রশ্ন হল গতিবেগ। পৃথিবীর আকর্ষণ কাটিয়ে বাইরে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন প্রচণ্ড বেগ। অঙ্ক কষে দেখা গেছে এই বেগ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় 11.9 km অর্থাৎ ঘণ্টায় চল্লিশ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি। আজকাল রকেটের সাহায্যে এর চেয়েও বেশি বেগে পৃথিবীর মহাকর্ষ ক্ষেত্র ছাড়িয়ে মহাশূন্যে উপগ্রহ ছাড়া সম্ভব হয়েছে। 1969 সালে চাঁদ থেকে মানুষ ঘুরে এসেছে। এ ছাড়া মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতির কাছাকাছি রকেট পাঠিয়ে সেখানকার ছবি আনা সম্ভব হয়েছে।

প্রশ্ন

1. স্থিতি ও গতি কাকে বলে ? পৃথিবী সকল বস্তুকে টানে কি করে বোঝাবে ? পৃথিবীর এই আকর্ষণ না থাকলে কি হত ?

2. মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ কাকে বলে ? এই দুটির মধ্যে প্রভেদ কোথায় ? সকল বস্তু কি একই হারে পৃথিবীতে এসে পড়ে ? গিনি ও পালক পরীক্ষা কি প্রমাণ করে ?

3. জোয়ার ও ভাটা সম্বন্ধে যা জান লেখ। গুরুস্ফীতি ও লঘুস্ফীতি কাকে বলে ?

4. বাক্য সম্পূর্ণ কর :

(ক) বস্তু গতিতে আছে বলা হয় যখন......

(খ) বস্তু স্থিতিতে আছে বলা হয় যখন......

5. বলো কেন। (৩/৪ লাইনের মধ্যে উত্তর দাও)

(ক) বাতাসের অবর্তমানে ভারি ও হালকা বস্তু একই সঙ্গে পৃথিবীতে এসে পড়ে।

(খ) চাঁদের কোন বায়ুমণ্ডল নেই।

(গ) মহাশূন্যে মহাকাশচারীরা বর্ম পরে থাকে।

(ঘ) পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘোরে।

(ঙ) চাঁদে সহজেই লাফ দিয়ে ছোট ছোট নদীনালা পার হওয়া যায়।

6. উপর দিকে যাই ছোঁড় না কেন নিচে এসে পড়বে—কেন ? এমন কোন উদাহরণ তোমার জানা আছে যেখানে প্রকৃতির এই নিয়মকে লঙ্ঘন করা হয়েছে ?

7. পার্থক্য দেখাও :

(ক) মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ

(খ) ভর ও ভার

(গ) লঘুস্ফীতি ও গুরুস্ফীতি

(ঘ) জোয়ার ও ভাটা

8. শূন্য স্থান পূর্ণ কর :

(ক) পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব — কিলোমিটার।

(খ) পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব — কিলোমিটার।

(গ) সূর্যের ভর পৃথিবীর চেয়ে — গুণ বেশি।

(ঘ) পৃথিবীর অভিকর্ষ চাঁদের অভিকর্ষের চেয়ে — গুণ বেশি।

(ঙ) সূর্যের অভিকর্ষ পৃথিবীর অভিকর্ষের চেয়ে — গুণ বেশি।

9. পৃথিবীতে যে বস্তুর ওজন 1 kg সূর্যে তার ওজন 27 kg কেন ?

10. জোয়ার, ভাটা কাকে বলে ? একটি জোয়ার ও একটি ভাটার মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত ? ছবি এঁকে জোয়ার ও ভাটা কি ভাবে হয় বোঝাও। গুরুস্ফীতি ও লঘুস্ফীতি কখন হয় ?

11. সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :

স্থিতি, গতি, অভিকর্ষ, মহাকর্ষ, অন্তিম বেগ, চান্দ্র দিন, নিষ্ক্রমণ বেগ

৬ জ্যোতিষ, আকাশ ও আলো

নক্ষত্র পরিচয়

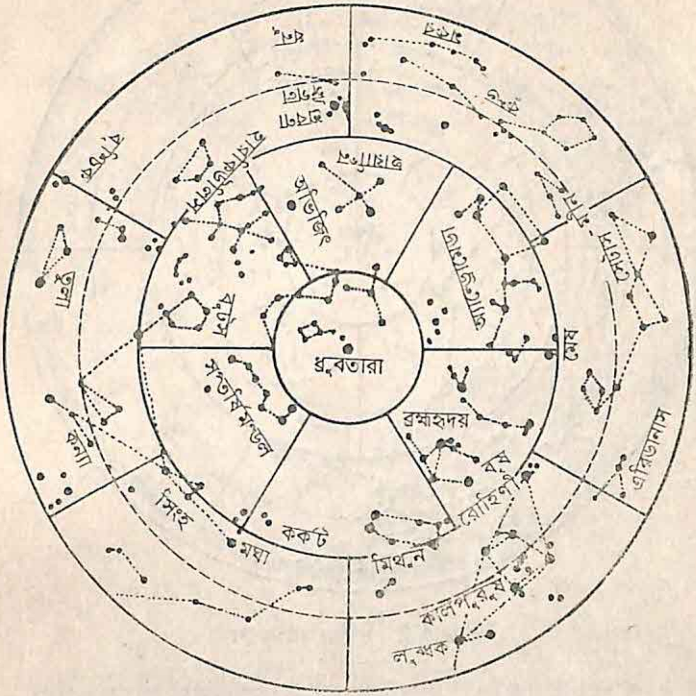
যে কোন দিন রাত্রিবেলা খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চাইলে তোমরা কি দেখতে পাও? একটি গোলার্ধ জুড়ে ছোট বড় নানা আকারের আলো ঝিকমিক করছে। পৃথিবীর বাইরে যে কোন আকাশচারী উজ্জ্বল বস্তুকে বলা হয় **জ্যোতিষ্ক**। আমাদের চোখে সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সূর্য যা দিনের আকাশ আলো করে রাখে। দিনের আকাশে নক্ষত্র ভর্তি আছে কিন্তু সূর্যের আলোর জন্য তাদের দেখা যায় না। তোমার মাথার উপরে একটি গোলাধ তুমি দেখতে পাচ্ছ। আর একটি গোলার্ধ আছে তোমার নিচে, পৃথিবীর আড়ালে। গোলকের কেন্দ্রে তুমি দাঁড়িয়ে আছ। দিক-চক্রবালের উপরের গোলার্ধ তুমি দেখতে পাচ্ছ, নিচেরটি পাচ্ছ না। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম ঠিক করে দেখে নাও। তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছ সেখানে তোমার মাথার উপর খাড়া একটি লাইন টানলে সেটি গোলকের যে বিন্দুতে পৌঁছয় তাকে বলা হয় জেনিথ বা স্থবিন্দু। প্রতি দিন সূর্য পূর্ব দিক থেকে ওঠে ও পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। পৃথিবী নিজের চারপাশে ঘোরে বলেই সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয় একথা তোমরা জান। আবার পৃথিবী ও অন্য গ্রহরা যে সূর্যের চারপাশে ঘুরছে আর উপগ্রহ চাঁদ ঘুরছে পৃথিবীর চারপাশে, এ-ও তোমাদের জানা আছে। এমন কি সূর্যও তার নিজের চারপাশে প্রায় সাতাশ দিনে একবার ঘোরে। কিন্তু আমরা যখন পৃথিবী থেকে আকাশের দিকে দেখি তখন মনে হয় আমাদের কেন্দ্র করে আকাশের সমস্ত জ্যোতিষ্ক ঘুরছে। সূর্য ও চাঁদের যেমন উদয় ও অস্ত আছে তেমনি অন্য যে সব জ্যোতিষ্ক আমরা দেখতে পাই তারাও উদয় হয় ও

অস্ত যায়। জ্যোতিষ্কগুলির মধ্যে আছে নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহ। সূর্য, চাঁদ ও গ্রহগুলি নক্ষত্রগুলির পরিপ্রেক্ষিতে নানাভাবে চলাফেরা করে। এই চলাফেরা কি করে বোঝা যাবে?

তোমাদের মনে হতে পারে নক্ষত্র ও গ্রহে তফাৎ কি? নক্ষত্র হল বিরাট বড় জ্বলন্ত বস্তুপিণ্ড। সব নক্ষত্র অবশ্য সমান বড় নয়। কোনটি বেশ বড় আবার কোনটি ছোট। প্রায় প্রত্যেকেরই নিজস্ব আলো দেবার ক্ষমতা আছে। এই আলোর জন্যই আমরা নক্ষত্রকে দেখতে পাই। কোন কোন নক্ষত্রের তাপমাত্রা খুব বেশি, কোনটির আবার সেই তুলনায় কম। সূর্য একটি অতি সাধারণ নক্ষত্র। গ্রহগুলি নক্ষত্রের তুলনায় আকৃতিতে অনেক ছোট। এদের নিজস্ব আলো নেই। সূর্যের আলো প্রতিফলিত করার জন্যই আমরা তাদের দেখতে পাই। গ্রহগুলি সূর্যের চারপাশে উপবৃত্তাকার পথে ঘোরে আর উপগ্রহগুলি একই ভাবে ঘোরে গ্রহদের চারপাশে। উপগ্রহগুলিরও নিজস্ব আলো নেই, সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে। আমাদের পৃথিবী সূর্যের একটি গ্রহ আর চাঁদ পৃথিবীর উপগ্রহ। সূর্যের অন্যান্য গ্রহগুলি নক্ষত্রদের তুলনায় পৃথিবীর কাছে থাকায় তাদের আমরা বিভিন্ন রাতে বিভিন্ন অবস্থানে দেখতে পাই। প্রাচীন দিনের লোকেরা সেইজন্যই গ্রহদের নাম দিয়েছিল প্ল্যানেট বা ওয়াণ্ডারার।

আর একটা অবস্থা কল্পনা কর। মনে কর তুমি উত্তর মেরুতে দাঁড়িয়ে আছ। তখন আকাশে তোমার মাথার ঠিক উপরে কোন নক্ষত্র দেখতে পাবে? ধ্রুবতারা। এ কথা নিশ্চয় বলে দিতে হবে না। উত্তর মেরুতে ছ'মাস দিন, ছ'মাস রাত। যখন দিন তখন সূর্যের উদয় কিংবা অস্ত নেই। সূর্য সেখানে মাথার উপর দিয়ে না গিয়ে দিকচক্রবালের চারপাশ দিয়ে 24 ঘণ্টায় একবার ঘুরে যায়। উত্তর মেরুতে যখন রাত ধ্রুবতারা মাথার উপর মধ্য আকাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আর অন্যান্য নক্ষত্রেরা ধ্রুবতারাকে কেন্দ্র করে 24 ঘণ্টায় একবার ঘোরে। উত্তর গোলার্ধের আকাশের

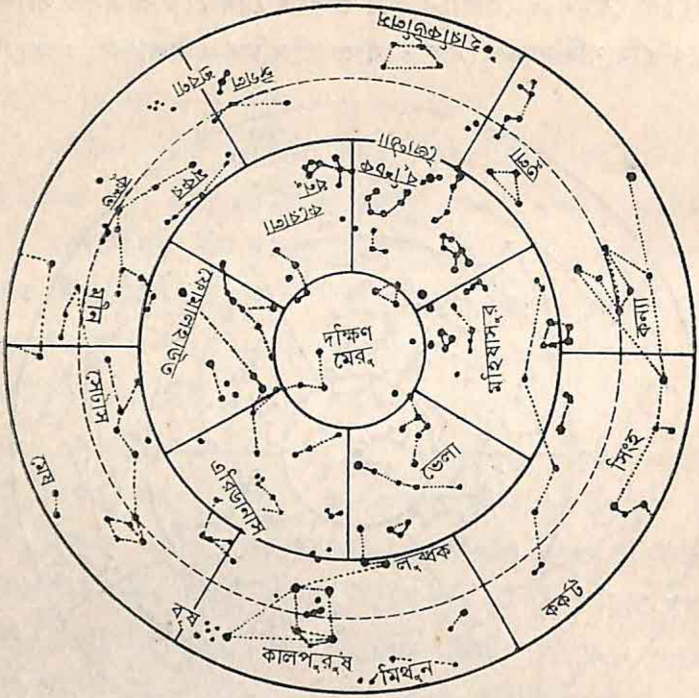
নক্ষত্রেরা কেমন ভাবে থাকে 6.1 ছবিতে দেখ। ঠিক একই ব্যাপার ঘটবে তুমি যদি দক্ষিণ মেরুতে যাও। দক্ষিণ গোলার্ধের নক্ষত্রদের



চিত্র 6.1 উত্তর আকাশ

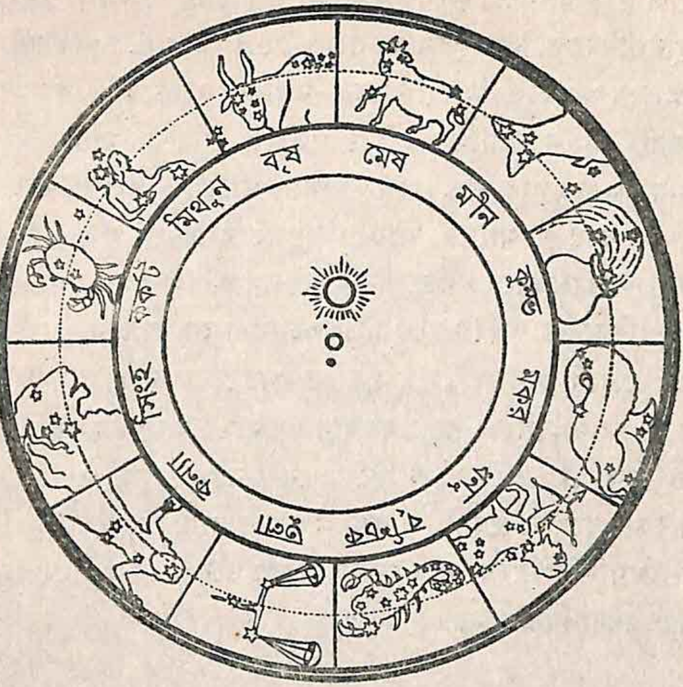
ছবি 6.2 চিত্রে দেখ। এই দুটি ছবি মিলিয়ে পৃথিবী থেকে দেখা পুরো আকাশের ছবি পাবে। 6.2 চিত্রের ডানদিকে যে নক্ষত্রেরা আছে দক্ষিণ গোলার্ধের ছবিতে বাঁ দিকে তাদের পাবে। অসংখ্য নক্ষত্রের নাম আছে। সবগুলি মুখস্থ করার দরকার নেই। কিন্তু ভাল করে আকাশে তাকালে এদের চিনতে পারবে।

6.1 আর 6.2 চিত্রে বিষুবরেখার কাছাকাছি একটি পটি দেখতে পাবে। পশ্চিম বাংলায় আমরা আছি বিষুবরেখার কিছু উত্তরে। সুতরাং ঐ পটিটি দেখা যাবে পূব থেকে পশ্চিমে আমাদের মাথার উপর দিয়ে (চিত্র 6.3)। দেখা গেছে সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহরা ঐ পটির মধ্যে ঘোরাফেরা করে। যে কোন সময়ে

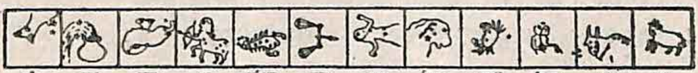


চিত্র 6.2 দক্ষিণ আকাশ

তাদের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করার জন্য ঐ পটিটি বারো ভাগে ভাগ করে প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতিষীরা তার নাম দেন **রাশিচক্র**। পৃথিবীর সূর্যের চারপাশে ঘুরে আসতে লাগে বারো মাস, তাই বারো ভাগ। এক এক মাসে সূর্য ঐ বারো রাশির এক একটিতে থাকে। বৈশাখ মাসে সূর্য থাকে মেষ রাশিতে, জ্যৈষ্ঠে বৃষ রাশিতে, আষাঢ়ে মিথুন, শ্রাবণে কর্কট, ভাদ্রে সিংহ, আশ্বিনে কন্যা, কার্তিকে তুলা, অগ্রহায়ণে বৃশ্চিক, পৌষে ধনু, মাঘে মকর, ফাল্গুনে কুম্ভ ও চৈত্রে মীন রাশিতে আসে। পটিটি যদি লম্বা করে ফেলা যায় তাহলে 6.4 ছবির মত দেখাবে। ছবিটি ভাল করে দেখ। প্রত্যেক রাশিতে যে নক্ষত্রগুলো আছে সেগুলো জুড়লে মোটামুটি একটা জানা চেহারা পাওয়া যাচ্ছে। যেমন মেষ রাশিতে ভেড়া, বৃষে ষাঁড়, মিথুনে তুজন মানুষ, কর্কটে



চিত্র 6.3



চিত্র 6.4

কাঁকড়া, সিংহ, কন্যা, তুলা বা ওজন দাঁড়ি, বৃশ্চিকে বিছা, ধনুতে শিকারীর হাতে ধনুক, মকরে এক ধরনের পৌরাণিক জন্তু, কুম্ভে কলসী ও মীনে মাছের মত দেখতে নক্ষত্রের সমষ্টি। প্রত্যেক রাশি ও তাদের নিয়ে নানা পৌরাণিক গল্প দেশে বিদেশে প্রচলিত আছে। কিন্তু মনে রাখবে সেগুলি গল্পই, সত্যি নয়।

রাশিচক্রকে ইংরেজীতে বলে জোডিয়াক চিহ্ন। এদের নাম যথাক্রমে এরিস, টরাস, জেমিনি, ক্যানসার, লিও, ভিরগো, লাইব্রা, স্কর্পিও, স্যাগিটেরিয়াস, কেপ্রিকর্নিয়াস, অ্যাক্ওয়েরিয়স ও পিসেস।

এ ছাড়াও আরো অনেক নক্ষত্রমণ্ডল রয়েছে। যেমন সপ্তর্ষিমণ্ডল, লঘু সপ্তর্ষিমণ্ডল, কালপুরুষ ইত্যাদি। 6.1 এবং 6.2 ছবি দুটি লক্ষ করে দেখ। ওতে আরো অনেক নক্ষত্রমণ্ডল আছে। কলকাতার বিড়লা প্ল্যানেটেরারিয়মে গিয়ে তোমরা বিভিন্ন মাসে কোথায় কোন নক্ষত্রের অবস্থিতি দেখে আসতে পারো। খবরের কাগজেও অনেক সময় এ মাসের আকাশ বলে ছবি দেখতে পাবে। খালি চোখে আকাশ দেখে নক্ষত্র চেনার অভ্যাস করাই সব থেকে ভাল।

রাশিচক্রের সাহায্যে জ্যোতিষ চর্চা করা হত প্রাচীন কালে যখন খালি চোখে আকাশ দেখে গ্রহ ও নক্ষত্রদের অবস্থান নির্ণয় করা হত। আজকাল এ সবের দরকার হয় না। আজকালকার দূরবীণ এত সূক্ষ্ম যে তাতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের নতুন নতুন তথ্য এখনও আবিষ্কার হয়ে চলেছে। এ কথা অবশ্য তোমাদের না বললেও চলবে যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গে ফলিত জ্যোতিষের কোন সম্পর্ক নেই, কারণ সেটা বিজ্ঞান নয়।

মহাকাশের আয়তন

এখন খুব শক্তিশালী রেডিও টেলিস্কোপের সাহায্যে মহাকাশের বহু দূর প্রান্তের সব নক্ষত্রদের খবর পাওয়া গেছে যা খালি চোখে দেখা তো সম্ভব ছিলই না—এমন কি সাধারণ টেলিস্কোপেও দেখা যেত না। কোন কোন নক্ষত্রমণ্ডল আমাদের থেকে এত দূরে আছে যে সেখান থেকে পৃথিবীতে আলো পৌঁছতেই লেগে যায় কোটি কোটি বছর। খালি চোখে দেখা যায় প্রায় 6,000 নক্ষত্র, ছোট টেলিস্কোপে 10 লক্ষ নক্ষত্র। 200 ইঞ্চি ব্যাসের টেলিস্কোপে প্রায় 2,000 কোটি নক্ষত্র। এইসব নক্ষত্রগুলো কেমন ভাবে ছড়ানো আছে? দেখা গেছে এরা ঝাঁক বেঁধে থাকে। এইসব নক্ষত্রপুঞ্জ বা তারার ঝাঁককে বলে **গ্যালাক্সি**। আমাদের সূর্য ও তার নটি গ্রহ ও যেসব নক্ষত্র দেখা যায় সেগুলি যে গ্যালাক্সির অন্তর্গত তার নাম **ছায়াপথ**, ইংরেজীতে মিলকি ওয়ে। অনেক সময় একে বাংলায় **আকাশগঙ্গাও**

বলা হয়। এই ছায়াপথ রাতের আকাশে উত্তর থেকে দক্ষিণে দেখা যায় উজ্জ্বল ধোঁয়ার মত। আমাদের এই ছায়াপথে আনুমানিক 15,000 কোটি নক্ষত্র আছে, খালি চোখে এই গ্যালাক্সির বাইরে আর একটি মাত্র গ্যালাক্সি দেখা যায় অস্পষ্ট এক ছোট আলোর মত। তার নাম অ্যাণ্ড্রোমীডা। এটি একটি সর্পিল নীহারিকা, পৃথিবী থেকে 22 লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে।

টেলিস্কোপে দেখা যায় আমাদের ছায়াপথ পার হয়ে মহাশূন্য, সেখানে কোন জ্যোতিষ্ক নেই, তারপরে আবার একটি গ্যালাক্সি, তার ওপারে ফাঁকা মহাশূন্য, তারপরে অন্য গ্যালাক্সি, এইভাবে যে কতদূর চলে গেছে তার সঠিক হিসেব এখনো করে ওঠা যায়নি। অ্যাণ্ড্রোমীডা পরিষ্কার আকাশে খালি চোখে দেখা যায়।

আলোকবর্ষ কি ?

আলোকবর্ষ দূরত্বের একটা বিশেষ মাপ। নক্ষত্রজগতের বেলায় আমাদের সাধারণ দূরত্বের মাপকাঠি কিলোমিটার ইত্যাদি অচল, কেননা সেখানে অসম্ভব ও অকল্পনীয় দূরত্ব নিয়ে ভাবতে হবে। তাই এই বিশেষ এককের ব্যবহার। আলোর গতি সেকেণ্ডে 2,99,792 কিলোমিটার। এক বছরে আলো যতটা পথ অতিক্রম করে ততটা হল এক **আলোকবর্ষ**। নামে বর্ষ হলেও আলোকবর্ষ কিন্তু সময় নির্দেশ করে না, দূরত্ব নির্দেশ করে। এক আলোকবর্ষ হল 9.5×10^{12} কিলোমিটার। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে আট মিনিট। এর থেকে তোমরা কিলোমিটার এককে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব বার করতে পার। আবার আমাদের ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে সূর্যের দূরত্ব 26,000 আলোকবর্ষ। আমরা যখন খালি চোখে নক্ষত্রদের মিটমিটে আলো দেখতে পাই তখন আসলে আমরা তাকাচ্ছি অনেক অতীতের দিকে। ঐ নক্ষত্রের আলো যাত্রা করেছে কত লক্ষ বছর আগে। যতক্ষণে সেটা আমাদের কাছে পৌঁছচ্ছে ততদিনে সেই নক্ষত্র কিন্তু নিভেও গিয়ে থাকতে পারে।

আমাদের সৌরজগৎ

প্রকাণ্ড এই বিশ্বের কাছে আমাদের সৌরজগৎ মনে হয় কতটুকু ছোট। তোমরা আগের ক্লাসে পড়েছ সূর্য এবং তাকে ঘিরে উপবৃত্তাকার পথে আবর্তিত নয়টি গ্রহ ও তাদের উপগ্রহ এই নিয়ে আমাদের সৌরজগৎ। সূর্যের কাছ থেকে শুরু করে গ্রহদের পরিচয় নিচের তালিকায় দেওয়া হল।

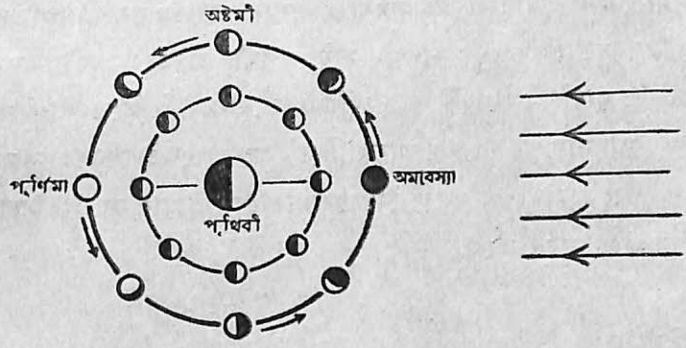
মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে আর কোন বড় গ্রহ নেই বটে তবে অসংখ্য ছোট ছোট গ্রহ আছে। তাদের একসঙ্গে বলা হয় গ্রহাণুপুঞ্জ বা অ্যাসটেরয়েডস। এদের মধ্যে প্রায় 2,000টির আলাদা করে নাম দেওয়া গেছে। এদের সবচেয়ে বড়টির ব্যাস 700 কিলোমিটার আর সবচেয়ে ছোটটির 3·2 কিলোমিটার।

গ্রহের নাম	সূর্য থেকে দূরত্ব লক্ষ কিলোমিটারে	ব্যাস কিলোমিটারে	উপগ্রহ
বুধ	576·0	4,646	নেই
শুক্র	1,075·0	12,320	নেই
পৃথিবী	1,496·0	1,275.6	1
মঙ্গল	2,264·0	6,744	2
গ্রহাণুপুঞ্জ	4,162·0	—	নেই
বৃহস্পতি	7,733·0	57,120	12
শনি	14,178·0	1,14,400	9 + 3বলয়
ইউরেনাস	28·528·0	51,200	5
নেপচুন	44,688·0	4,43,200	2
প্লুটো	58,720·0	5,760	নেই

চাঁদের কলা

তোমরা হয়ত শুনেছ চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই। সূর্যের আলো প্রতিফলিত হওয়ার জন্যই আমরা চাঁদের আলো বা জ্যোৎস্না দেখতে পাই। নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ প্রত্যেক দিন চাঁদের আকার বদলে যায় এবং একই সময়ে চাঁদ আকাশে দেখা যায় না। চাঁদের আকারের এই পরিবর্তনকে চাঁদের কলা বা ইংরেজীতে ফেজ বলে।

6.5 চিত্রে পৃথিবী ও তার পাশে চাঁদ দেখান হল। চাঁদ পৃথিবীর পাশে প্রায় বৃত্তাকার পথে ঘুরছে। সূর্য অনেক দূরে থাকায় তার অবস্থান সমান্তরাল রেখার সাহায্যে দেখান হল। পৃথিবী যেমন সূর্যের চারপাশে ঘুরছে, চাঁদও তেমনি পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে।



চিত্র 6.5

যেদিন আমরা চাঁদকে সবচেয়ে বড় ও গোল দেখি সেদিন পূর্ণিমা। এই দিনে সূর্য ও চাঁদ পৃথিবীর দুই বিপরীত দিকে থাকে। সূর্যের আলো চাঁদে প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে সোজা এসে পড়ায় চাঁদের আলো সেদিন সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আমরা পাই। অমাবস্যার রাতে চাঁদ থাকে পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে। চাঁদের অন্ধকার অংশ পৃথিবীর দিকে থাকায় চাঁদকে আমরা দেখতে পাই না। পূর্ণিমার দিন চাঁদ যখন আকাশে ওঠে সূর্য তখন অস্ত যায় এবং যখন সূর্য ওঠে তখন চাঁদ অস্ত যায়। তখন চাঁদকে আর দেখা যায় না। অমাবস্যার দিন চাঁদ সূর্যের সঙ্গে ওঠে ও সূর্যের সঙ্গেই অস্ত যায়।

অমাবস্যায় দিনের বেলায় চাঁদের অন্ধকার অংশ পৃথিবীর দিকে থাকে কিন্তু রাত্রে চাঁদ আদৌ আকাশে থাকে না। অমাবস্যার পরের রাতে আমরা চাঁদকে দেখি সরু কাস্তে বা কুমড়োর ফালির মত। পৃথিবী, চাঁদ ও সূর্য সে রাত্রে এক সরল রেখায় না থাকায় চাঁদের আলোকিত অংশের অতি সামান্য বৃত্তাংশ আমরা দেখতে পাই। অষ্টমীর রাতে চাঁদ, পৃথিবী ও সূর্য প্রায় সমকোণে থাকে। তখন পৃথিবী থেকে চাঁদের আলোকিত অংশের এক অর্ধাংশ আমরা দেখতে পাই। অষ্টমীর পরে চাঁদ যতই পূর্ণিমার অবস্থানের দিকে যাবে ততই আমরা আলোকিত অংশ বেশি দেখতে পাব এবং পূর্ণিমার রাতে সম্পূর্ণ অংশ দেখতে পাব। অমাবস্যা থেকে পূর্ণিমা, আবার পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যা এই সময়কে চাঁদের কলা অনুযায়ী প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী, একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী ও চতুর্দশী এই চৌদ্দটি তিথিতে ভাগ করা হয়। পূর্ণিমার পর চাঁদের আলোকিত অংশ একই ভাবে কমতে থাকে এবং অমাবস্যার রাতে চাঁদকে আর দেখাই যায় না। এইভাবে চাঁদের কলা বাড়ে কমে।

আরিস্টটল

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি কেমন ভাবে চলছে এই নিয়ে অনেকদিন ধরে পণ্ডিতরা নানারকম মত প্রকাশ করেছেন। খ্রীস্ট জন্মের চারশো বছর আগে গ্রীসে আরিস্টটল নামে এক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর মত অনুসারে পৃথিবী সমস্ত বিশ্বের কেন্দ্রে। পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্য, চাঁদ ও গ্রহরা ঘুরছে। কি ভাবে ঘুরছে? এই প্রশ্নের অদ্ভুত সমাধান করেন তিনি। তিনি বলেন প্রত্যেকটি গ্রহ একটি স্বচ্ছ গোলকের মধ্যে আঁটা আছে। ঐ গোলকগুলি ঘুরছে, গ্রহকে নিয়ে। সবার শেষে আট নম্বর গোলকে বাকি সব তারাগুলো সাঁটা আছে। তোমরা সহজেই ধরতে পারছ কোথায় কোথায় তাঁর ভুল হয়েছিল। কিন্তু আরিস্টটল অন্য নানা

বিষয়ে এত জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পর কয়েক শ বছর এই ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্বই অভ্রান্ত বলে মনে করা হত। এমনকি আরিস্টটলের মতের বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে তাকে শাস্তি পেতে হত।

নিকোলাস কোপারনিকাস (1473—1543)

আরিস্টটলের মত অনুযায়ী তখন পণ্ডিতদের ধারণা ছিল পৃথিবীর কোন গতি নেই। তাঁরা মনে করতেন এত বড় একটা নিরেট বস্তু নিজের চারদিকে ঘুরপাক খেলে আর আস্ত থাকত না, ভেঙে চুরমার হয়ে যেত। তাঁদের ধারণা ছিল পৃথিবী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে কেন্দ্র করেই সূর্য নক্ষত্র ইত্যাদি আবর্তন করছে। যাঁদের পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা আর গবেষণার ফলে এই সব ভুল ধারণা ভেঙে গিয়ে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন হল তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে আগে নাম করা উচিত কোপারনিকাসের।



কোপারনিকাস

পোল্যাণ্ডের থর্ন নামক জায়গায় নিকোলাস কোপারনিকাসের জন্ম 1473 খ্রীস্টাব্দে। অঙ্ক আর জ্যোতিষ তাঁর প্রিয় বিষয় হলেও তাঁকে আইন ও চিকিৎসাশাস্ত্র পড়তে হয়েছিল, কারণ তখনকার দিনে ভাল চাকরী পেতে গেলে এ দুটি বিষয় জানতেই হত। তিনি গীর্জায় একটি উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন। তখনকার দিনে এই ধর্ম প্রতিষ্ঠানই দেশ চালাত। একত্রিশ বছর ধরে তিনি সাহিত্য, কাব্য, ছবি আঁকা, মুদ্রা সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ের চর্চা করেন। এছাড়া তাঁর প্রিয় বিষয় গণিত আর জ্যোতিষ ত ছিলই।

একত্রিশ বছর ধরে তিনি চিন্তা করেছিলেন ভূকেন্দ্রিক ব্রহ্মাণ্ডের

বদলে কিভাবে সূর্যকেন্দ্রিক ব্রহ্মাণ্ডের ধারণা প্রতিষ্ঠিত করা যায় যাতে সমস্ত গ্রহনক্ষত্রের গতিরহস্যের একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হতে পারে। কোপারনিকাসের মত অনুসারে ব্রহ্মাণ্ডের কাঠামো হল একটি গোলক, তার মধ্যে নক্ষত্রগুলি স্থির আছে। গতিশীল বস্তুদের মধ্যে তিনি নাম করেছেন শনি, বৃহস্পতি, শুক্র ইত্যাদি। এদের সকলের মাঝখানে সূর্য একটি উজ্জ্বল প্রদীপের মত। এই প্রদীপের আলোয় অন্য সব বস্তু আলোকিত হচ্ছে।

পৃথিবীর আবর্তনের কথা অবশ্য এর আগে জ্যোতির্বিদ আর্যভটও ভেবেছিলেন, তবে তিনি কোনো প্রমাণ বা পরীক্ষার কথা লিখে যাননি। কোপারনিকাস অঙ্কের হিসেব করে দেখান যে তাঁর মতের সঙ্গে এইভাবে ব্রহ্মাণ্ডের দৃশ্য গতির মিল দেখানো যায়।

এ ছাড়া আপেক্ষিক গতি নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন কোন বস্তুকে গতিশীল বলে মনে হলে সেটা দর্শকের গতির জন্য হতে পারে, সেই বস্তুর গতির জন্য হতে পারে, আবার উভয়ের গতির জন্যও হতে পারে। পৃথিবীর যদি কোন গতি থাকে তবে পৃথিবীর বাইরে প্রত্যেক বস্তুতেই সেই গতি দেখা যাবে, তবে বিপরীত দিকে।

পৃথিবী যদি স্থির থাকে তাহলে অন্য গ্রহদের গতির কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। কোপারনিকাসের মতে পৃথিবীর গতি আছে সুতরাং গ্রহদের গতিরও একটা ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। তবে আমরা এখন জানি গ্রহদের কক্ষপথ উপবৃত্তাকার। কোপারনিকাস এগুলি বৃত্তাকার কল্পনা করে ভুল করেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল বৃত্তই সবচেয়ে স্বাভাবিক পথ। তাঁর নক্ষত্র গোলকের পরিকল্পনাও ঠিক ছিল না। তিনি বলেছিলেন নক্ষত্রগোলকের নিজস্ব কোন আবর্তন নেই। পৃথিবী নিজের অক্ষের চারদিকে ঘুরছে বলে মনে হয় নক্ষত্রগোলকও ঘুরছে।

কোপারনিকাসের সারা জীবনের গবেষণার ফল বইটি যখন প্রকাশিত হয় তখন তিনি মৃত্যুশয্যায়।

জোহান কেপলার (1571—1630)

কেপলারের জন্ম হয় জার্মানির স্টুটগার্টের কাছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময় থেকেই তিনি কোপারনিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদের সমর্থক হয়ে পড়েন। এই মত ছিল তখনকার প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী। ফলে তিনি কোন ধর্মপ্রতিষ্ঠানে চাকরী পেলেন না। তখন তিনি গণিত ও জ্যোতিষ শিক্ষকতাই বেছে নিলেন। পরে তিনি প্রাগে নতুন তৈরি মানমন্দিরের অধ্যক্ষ হন। এখানে গ্রহদের গতি ও 1604 সালের একটি নতুন নক্ষত্র নিয়ে তাঁর গবেষণা খুব খ্যাতি অর্জন করে।



জোহান কেপলার

প্রাগের মানমন্দিরে কেপলারের উপর ভার ছিল মঙ্গল গ্রহ পর্যবেক্ষণ করে তার গতি সমস্যার সমাধান খুঁজে বার করা। পৃথিবীকে স্থির কল্পনা করায় অন্য গ্রহগুলির গতিপথ বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল। কোপারনিকাস সূর্যকেন্দ্রিক জগতের কল্পনা করায় এই সমস্যার খানিকটা সমধান হলেও পুরোটা হয়নি।

মঙ্গল গ্রহ অনেকদিন ধরে পর্যবেক্ষণ করে যে সব তথ্য পাওয়া গিয়েছিল কেপলার তার সঙ্গে নিজের পর্যবেক্ষণ যোগ করলেন। তারপর দেখলেন জ্যামিতি অথবা অঙ্কের হিসেবে কোন একটা সূত্র বার করা যায় কিনা। তিনি দেখলেন মঙ্গলের কক্ষপথ যদি উপবৃত্ত কল্পনা করা যায় তাহলেই সব সমস্যায় সমাধান হয়।

গ্রহগতি সম্বন্ধে তিনি তিনটি সূত্র রচনা করেন। সূত্রগুলিতে বলা হয়েছে সূর্যকে কেন্দ্রে রেখে গ্রহগুলি উপবৃত্তাকার পথে পরিক্রমণ করছে। এই গতিপথে কিভাবে ও কিরকম বেগে গ্রহ চলতে থাকে এবং সূর্য থেকে গ্রহের বিভিন্ন সময়ের দূরত্বের মধ্যেও

যে একটা অনুপাত আছে এইসব হিসেবগুলি তিনি তাঁর তিনটি সূত্রে প্রকাশ করেন।

কেপলারের ব্যাখ্যার মধ্যে যেটুকু ফাঁক ছিল পরে নিউটন সেটি পূর্ণ করেন। মহাকর্ষ সম্বন্ধেও কেপলার কিছুটা চিন্তা করে থাকবেন, কারণ তিনি বলেছিলেন বস্তুরা পরস্পরকে আকর্ষণ করে। একটি পাথরের টুকরোর উপর থেকে নিচে পড়ার কারণ মাটি তাকে আকর্ষণ করছে।

কেপলারের শেষ জীবন খুবই দুঃখে কাটে। তখন ইউরোপে ধর্ম নিয়ে বিরোধ চলেছে, সর্বত্র রাজনৈতিক অস্থিরতা। এই অবস্থায় কেপলারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রায় বন্ধ হবার মত হয়।

গ্যালিলিও গ্যালিলি (1564-1642)

আমরা আগেই দেখেছি বিজ্ঞানীর কাজ প্রকৃতিতে যেসব ঘটনা ঘটছে সেগুলি কেমন করে ঘটছে তা বুঝতে চেষ্টা করা। এর জন্যে প্রথমে দরকার পর্যবেক্ষণ অর্থাৎ চোখ কান খোলা রাখা। তারপর যা ঘটতে দেখা গেল তাকে বুদ্ধি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করা। গ্যালিলিও ছিলেন এই ধরনের প্রখর বুদ্ধির অধিকারী। তিনি সব সময়ে হাতে কলমে পরীক্ষা করে দেখতে ভালবাসতেন। আঠারো বছর বয়সে একদিন হঠাৎ তাঁর নজর পড়ল পিসার এক গির্জায় ঝোলানো একটি আলোর দিকে। আলোটা এদিক থেকে ওদিক দুলছিল। গ্যালিলিও নিজের নাড়ি টিপে সময় গুণে দেখলেন আলোটা প্রত্যেকবার এক দিক থেকে আর এক দিকে যেতে একই সময় নিচ্ছে। যদি আলোটা অনেকখানি টেনে ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে অনেকটা বেশি জায়গা নেবে ঠিকই, কিন্তু দোলার সময় একই থাকবে। এটা একটা খুব দরকারী আবিষ্কার। পরে তোমরা যখন পেণ্ডুলাম সংক্রান্ত অঙ্ক শিখবে তখন এ বিষয়ে আরো জানবে।

1564 সালে পিসায় জন্ম তাঁর। বাবার ছিল কাপড়ের ব্যবসা। সতেরো বছর বয়সে ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন ডাক্তারি

পড়তে। কিন্তু অঙ্কেই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশি। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে তিনি অঙ্কের অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। তিন বছর পরে তিনি অন্য রাজ্যে চলে যান—ভেনিসের পাডুয়াতে। সেখানে তিনি অনেক গবেষণা আর আবিষ্কার করেন। তারপর 1610-এ আবার ফিরে আসেন ফ্লোরেন্সে।

1609 সালে তিনি শুনতে পান হল্যাণ্ডে এক চশমাওয়ালা নাকি এমন এক কাচ তৈরি করেছে যাতে দূরের জিনিস কাছে চলে আসে। গ্যালিলিও শুনেই ভাবতে বসে গেলেন কি করে এটা সম্ভব হল। তারপর তিনি নিজেই একটি দূরবীণ তৈরি করলেন এবং ঐ দূরবীণে চোখ দিয়ে গ্রহ নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। তখনই বাধল গণ্ডগোল। এতদিনকার প্রচলিত আরিস্টটলীয় মতবাদের সঙ্গে তাঁর দেখা অনেক জিনিসই মিলল না। গ্যালিলিও এই সম্বন্ধে একটা বই লিখলেন—তখন তুমুল তর্ক বেধে গেল। অনেক শত্রু হল তাঁর। শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষমা ভিক্ষা করতে হল ধর্মগুরু পোপের কাছে। তাঁকে বলতে বাধ্য করা হল সূর্য যে এই সৌরজগতের মাঝখানে আছে একথা মিথ্যা। অবশ্য গ্যালিলিও মনে মনে জানতেন তিনি আগে যা বলেছেন তাই ঠিক। বাড়িতে বন্দী অবস্থায় তাঁর শেষ জীবন কাটে।

গ্যালিলিও কী দেখেছিলেন ?

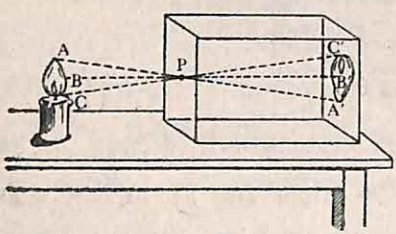
দূরবীণে চোখ দিয়ে গ্যালিলিও দেখতে পেলেন চাঁদের গায়ে নানারকম উঁচু নিচু পাহাড় ও গহ্বর। বড় বড় কালো দাগগুলোকে তিনি ভেবেছিলেন সমুদ্র। এর আগে লোকে চাঁদকে জানত একটি স্বর্গীয় বস্তু বলে—সেটি সমতল আকারের গোলক। পৃথিবীকে গ্রহ বলে মনে করায় প্রাচীনপন্থীদের প্রধান আপত্তি ছিল এই যে অন্য গ্রহদের মত পৃথিবীকে উজ্জ্বল দেখায় না। গ্যালিলিও বললেন চাঁদ থেকে দেখলে পৃথিবীকেও চাঁদের মতই উজ্জ্বল দেখাবে। খালি চোখে দেখা যায় না এমন অসংখ্য সব নক্ষত্র দূরবীণে দেখা গেল।

(খ) উইকেটের পাশ থেকে যদি চেয়ে দেখ দেখবে প্রথম দণ্ডটির দ্বারা অন্য দণ্ড দুটি আড়াল পড়েছে। যদি আলো বক্র রেখায় চলত তাহলে কি এদের দেখা যেত ?

সূচীছিদ্র ক্যামেরা

তোমরা এইমাত্র দেখলে আলো সরল রেখায় চলে। আলোর এই ধর্মকে কাজে লাগিয়ে সূচীছিদ্র বা পিনহোল ক্যামেরা তৈরি করা হয়। এই ক্যামেরার সাহায্যে কোন বস্তুর প্রতিকৃতি দেখা বা ফিল্ম তোলা যায়। এটি একটি আয়তাকার বাক্স যার এক মুখে একটি সরু ফুটো P আছে। ফুটোর বিপরীত দিকে বাক্সের মুখে একটা ঘষা কাচ বা ফিল্ম রাখার ব্যবস্থা আছে। বাক্সের ভিতর কালো রং লাগান আছে যাতে আলোর প্রতিফলন না হয়। ক্যামেরার সামনে ফুটো থেকে কিছু দূরে কোন বস্তু রাখলে। ঘষা কাচে তার উলটো প্রতিকৃতি দেখা যাবে বা ফিল্মে তার উলটো ছবি উঠবে।

মনে কর একটি মোমবাতির শিখা ABC ক্যামেরার সামনে রাখা হয়েছে (চিত্র 6.7)। A বিন্দু থেকে নির্গত আলোকরেখা সরল রেখায় P বিন্দুর ভিতর দিয়ে গিয়ে ঘষা কাচের A′ বিন্দুতে এসে পড়বে। সেইরকম B ও C বিন্দু থেকে নির্গত রেখা B′ ও C′ বিন্দুতে এসে পড়বে।



চিত্র 6.7

ABC রেখার প্রতিকৃতি A′B′C′ উলটোভাবে ঘষা কাচের উপর দেখতে পাওয়া যাবে। আলো সরল রেখায় চলার জন্যই উলটো প্রতিকৃতি দেখা যাবে।

মোমবাতিটা যদি ক্যামেরা থেকে ক্রমশ দূরে সরিয়ে নাও তাহলে দেখবে প্রতিকৃতির আকার ক্রমশ ছোট হচ্ছে। আবার ক্যামেরা ও বস্তু স্থির রেখে যদি পর্দাটিকে ক্রমশ সরিয়ে নিতে থাক

দেখবে প্রতিকৃতির আকার বড় হচ্ছে। সুতরাং প্রতিকৃতির আকৃতি ক্যামেরার ছিদ্র থেকে বস্তুর ও প্রতিকৃতির দূরত্বের উপর নির্ভর করে।

যদি ছিদ্র বড় হয় এই ছিদ্রকে অনেকগুলি সূচীছিদ্রের সমষ্টি বলে মনে করা যেতে পারে। প্রতিটি সূচীছিদ্রের জন্য যদি একটা প্রতিকৃতি হয় তবে অনেকগুলি প্রতিকৃতি অন্যের উপর পড়ে অস্পষ্ট প্রতিকৃতির সৃষ্টি করবে। ছিদ্র যত সরু হবে, প্রতিকৃতি তত স্পষ্ট হবে।

নিজে কর

একটা লম্বা জুতোর বা ওষুধের বাক্স নাও। একটা সূচ দিয়ে এক মুখ ফুটো কর। অন্য মুখের পিজবোর্ড সরিয়ে তেলা কাগজ বা অয়েল পেপার আঠা দিয়ে লাগাও। সামনে একটা জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে দেখ তেলা কাগজে কোন ছবি দেখতে পাচ্ছ কিনা। মোমবাতি কাছে বা দূরে নিয়ে গিয়ে প্রতিকৃতির দৈর্ঘ্য লক্ষ কর।

ছায়া

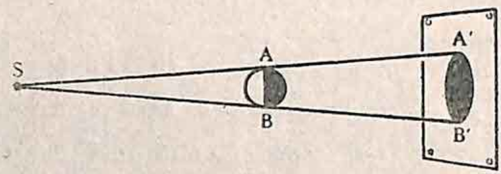
আলোর সামনে কোন অনচ্ছ বস্তু রাখলে বস্তুর গায়ে যেসব আলোকরশ্মি পড়ে সেগুলি বাধা পায়। বস্তুর পিছনের অংশ তাই অন্ধকার। সেখানে কোন পর্দা রাখলে দেখবে অন্ধকার অংশ কালো দেখাচ্ছে। এই অন্ধকার অংশকে বস্তুর **ছায়া** বলে। ছায়ার আকৃতি বস্তুর ও অবস্থানের উপর নির্ভর করে। একটা আলোর সামনে তোমার হাত ধর। দেখবে দেওয়ালে পাঁচ আঙুল সমেত হাতের চেটোর ছায়া পড়েছে। চেটোটাকে এবার আড়াআড়ি ভাবে ধর। দেওয়ালে একটা কালো লাইনের মত ছায়া দেখতে পাবে, আঙুলের কোন চিহ্ন নেই। বস্তুকে আলোর কাছে সরিয়ে আনলে পর্দায় ছায়ার আকৃতি বাড়ে আর আলো থেকে দূরে নিয়ে গেলে কমে। আমরা যখন রোদে ঘুরে বেড়াই তখন আমাদের পাশে ছায়া পড়ে। সকাল বেলায় ছায়া থাকে লম্বা, কারণ সূর্য তখন দিগন্তে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছায়া

কমতে থাকে এবং দুপুরের রোদে সবচেয়ে ছোট হয় কারণ তখন সূর্য প্রায় মাথার উপর। দুপুরের পর থেকে ছায়া আবার লম্বা হতে থাকে এবং বিকেলবেলায় সবচেয়ে বেশি লম্বা হয়।

ছায়ার আকার যেমন বস্তুর আকারের উপর নির্ভর করে তেমনি আলোর উৎসের আকারের উপরও নির্ভর করে। সেটা কেমনভাবে হয় নিচে আলোচনা করা হল।

(ক) আলোর বিন্দু উৎস এবং বিস্তৃত বস্তু

মনে কর S আলোর বিন্দু উৎস এবং AB একটি অনচ্ছ বস্তু



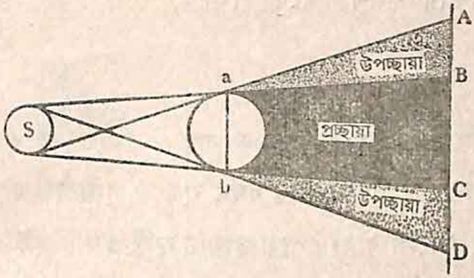
চিত্র 6.8

(চিত্র 6.8)। AB বস্তু, S-এর চেয়ে আকারে বড়। S বিন্দু থেকে SA যোগ করে বাড়ালে পর্দায় A' বিন্দুতে মিলিত হয়। একই ভাবে SB রেখা পর্দায় B' বিন্দুতে এসে পড়েছে। তোমরা আগেই পড়েছ আলো সরল রেখায় চলে। সুতরাং S বিন্দু থেকে নির্গত এবং SAA' ও SBB' রেখা দুটির মধ্যে অবস্থিত যে কোন রশ্মি থাকলে AB বস্তুতে বাধা পাবে এবং পর্দায় যেতে পারবে না। কিন্তু এই রেখা দুটোর বাইরের আলো পর্দায় যেতে পারবে। সুতরাং পর্দার A'B' অংশ AB বস্তুর ছায়া।

(খ) উৎস বিস্তৃত কিন্তু বস্তুর চেয়ে ছোট

S আলোর বিস্তৃত উৎস, ab একটি অনচ্ছ বস্তু এবং ABCD একটি পর্দা (চিত্র 6.9)। আলোর উৎস আকারে বস্তুর চেয়ে ছোট। উৎসের দুই প্রান্তীয় বিন্দু থেকে যদি আগের মত ছবি আঁক তাহলে পর্দায় ABCD ছায়া দেখতে পাবে। লক্ষ করে দেখ BC অংশ সম্পূর্ণ অন্ধকার। উৎসের কোন অংশ থেকেই এখানে আলো

এসে পড়বে না। একে প্রচ্ছায়া বা আমব্রা বলে। AB অংশে উৎসের নিচের দিক থেকে কোন আলো আসে না কিন্তু উপর দিক থেকে আলো আসে। সেইরকম CD অংশে উৎসের উপর

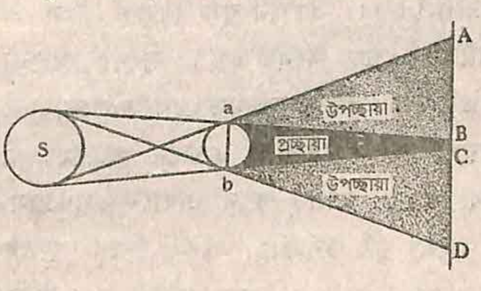


চিত্র 6.9

দিক থেকে কোন আলো আসে না কিন্তু নিচের দিক থেকে আলো আসে। AB ও CD অংশ আংশিক আলোকিত। এই অংশকে পেনআমব্রা বা উপচ্ছায়া বলে। পর্দাকে যদি ক্রমশ আলোর কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়ার আকার ক্রমশ বাড়তে থাকবে। ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে। পর্দাকে যদি আলোর দিকে নিয়ে যাও প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়ার আকার ক্রমশ কমতে থাকবে।

(গ) উৎস বিস্তৃত এবং বস্তুর চেয়ে বড়

S আলোর বিস্তৃত উৎস, ab অনচ্ছ বস্তু এবং ABCD পর্দা



চিত্র 6.10

আলোর উৎস আকারে বস্তুর চেয়ে বড় (চিত্র 6.10)। উৎসের দুই প্রান্তীয় বিন্দু থেকে যদি সরল রেখা আঁকো তবে ABCD ছায়া

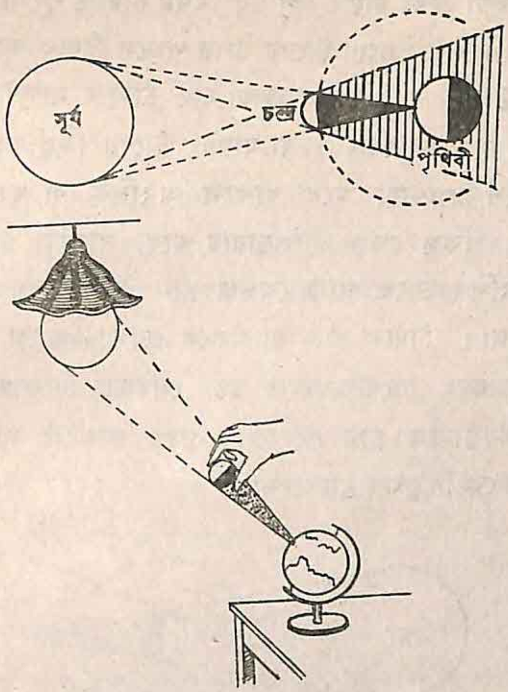
পাবে। BC অংশ প্রচ্ছায়া এবং AB ও CD অংশ উপচ্ছায়া অঞ্চল। পর্দাকে যদি উৎস থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাও তবে উপচ্ছায়া অঞ্চলের আকার ক্রমশ বাড়তে থাকবে এবং প্রচ্ছায়া অঞ্চলের আকার ক্রমশ কমতে থাকবে।

গ্রহণ

চাঁদ ও পৃথিবী উভয়েই অনচ্ছ বস্তু। নিজেদের কক্ষপথে চলতে চলতে অমাবস্যার দিনে চাঁদ যখন সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে আসে তখন সূর্যের আলো বাধা পেয়ে ছায়ার সৃষ্টি হয়। এই ছায়া পৃথিবীর যে অঞ্চলে পড়ে সেখানকার লোকেরা চাঁদ আড়াল করায় সূর্যের কিছু অংশ বা সম্পূর্ণ অংশ দেখতে পায় না। এই ঘটনাকে **সূর্যগ্রহণ** বলে। পূর্ণিমার রাতে চাঁদ ও সূর্যের মাঝখানে এসে পড়ে পৃথিবী। তখন পৃথিবীর ছায়া চাঁদের যে অংশে পড়ে সে অংশ কালো দেখায়। এই ঘটনাকে **চন্দ্রগ্রহণ** বলে। পৃথিবীর ছায়া চাঁদকে সম্পূর্ণভাবে বা আংশক ভাবে ঢেকে ফেলতে পারে। আংশিক গ্রহণকে **খণ্ডগ্রাস** গ্রহণ এবং সম্পূর্ণ গ্রহণকে **পূর্ণগ্রাস** গ্রহণ বলে।

(ক) সূর্যগ্রহণ

পৃথিবীর চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে চাঁদ পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে এসে পড়ে (চিত্র 6.11)। এখানে সূর্য বিস্তৃত উৎস এবং চাঁদ অনচ্ছ বস্তু। সূর্য চাঁদের চেয়ে অনেক বড়। সূর্যের আলো বাধা পেয়ে চিত্র 6.10 এর মত একটি শংকুর মত দেখতে প্রচ্ছায়া এবং তার পাশে দুটি উপচ্ছায়ার সৃষ্টি হয়েছে। এখানে প্রচ্ছায়া অঞ্চলে দাঁড়িয়ে সূর্যকে দেখা যাবে না। তখন এখানে পূর্ণগ্রাস গ্রহণ হবে। প্রচ্ছায়ার পাশের দুটি উপচ্ছায়া অঞ্চল থেকে সূর্যের দিকে চাইলে কিছু অংশ আলোকিত ও কিছু অংশ অন্ধকার দেখাবে। এক অংশ থেকে উপরের অংশ দেখা যাবে কিন্তু নিচের অংশ দেখা যাবে না। অন্য অংশে ঠিক উলটো। এখান থেকে নিচের অংশ দেখা যাবে



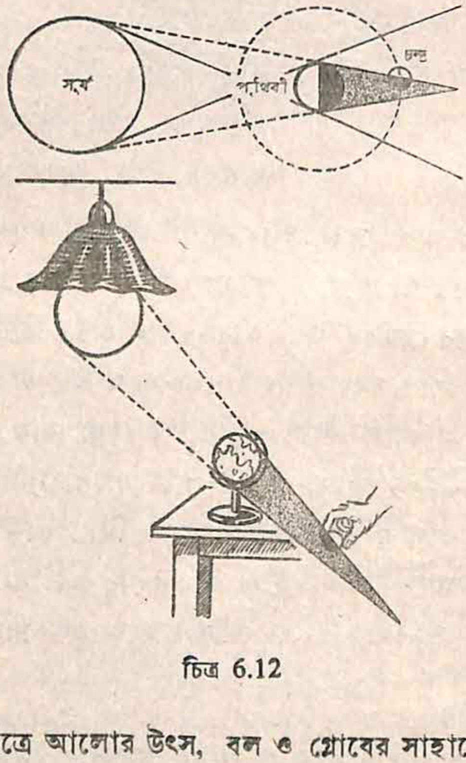
চিত্র 6.11

কিন্তু উপরের অংশ দেখা যাবে না। এই দুই অংশ থেকে সূর্যের খণ্ডগ্রাস গ্রহণ দেখা যাবে। সূর্যগ্রহণ কি ভাবে হয় একটি আলোর সামনে বল ধরে গ্লোবের উপর ছায়া ফেলে 6.11 চিত্রে দেখান হল। পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যের আলো না থাকায় চারদিক অন্ধকার হয়ে ওঠে। আকাশে তারা ও ম্লান চাঁদ দেখা যায়। সূর্যগ্রহণের সময় চাঁদের যে পিঠ আমরা দেখতে পাই সে পিঠ পৃথিবীর দিকে মুখ করে থাকে, ফলে সূর্যের কোন আলো এ পিঠে পড়ে না। পৃথিবী থেকে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে চাঁদের এই পিঠে এসে পড়লে অল্প আলোকিত দেখায়। এই জন্যই চাঁদকে তখন ম্লান দেখায়।

(খ) চন্দ্রগ্রহণ

পূর্ণিমার রাতে পৃথিবী চাঁদ ও সূর্যের মাঝখানে আসে। চাঁদের নিজের কোন আলো নেই। সূর্যের আলো প্রতিফলিত করার জন্য

চাঁদের জ্যোৎস্না দেখা যায়। পৃথিবী যখন চাঁদ ও সূর্যের মাঝখানে আসে তখন পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর পড়লে চাঁদকে কালো দেখায় (চিত্র 6.12)। পৃথিবীর প্রচ্ছায়া যদি চাঁদকে সম্পূর্ণভাবে ঢেকে ফেলে তবে পূর্ণগ্রাস গ্রহণ দেখা যায়। চাঁদের কিছু অংশ প্রচ্ছায়া ও কিছু অংশ উপচ্ছায়ার মধ্যে থাকলে আংশিক বা খণ্ডগ্রাস গ্রহণ দেখা যায়। কিন্তু কোন উপচ্ছায়ার মধ্যে থাকলে চাঁদের গায়ে আলো আংশিক ভাবে পড়ে, সেজন্য ম্লান দেখায় তবে কোন গ্রহণ দেখা যায় না। চাঁদকে প্রচ্ছায়া অঞ্চলে ঢোকার আগে সব সময়েই উপচ্ছায়া অঞ্চলে প্রবেশ করতে হয়, সেইজন্য চাঁদে গ্রহণ লাগার কিছু আগে চাঁদকে ম্লান দেখায়। গ্রহণ ছাড়বার পরেও একই কারণে চাঁদকে কিছুক্ষণ ম্লান দেখায়।



চিত্র 6.12

6.12 চিত্রে আলোর উৎস, বল ও গ্লোবের সাহায্যে চন্দ্র গ্রহণ কিভাবে ঘটে থাকে দেখান হল।

অমাবস্যায় সূর্যগ্রহণ ও পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হয়। কিন্তু প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় গ্রহণ হয় না কেন ? গ্রহণের সময় সূর্য, চাঁদ ও পৃথিবীকে একই সরল রেখায় আসতে হয়। পৃথিবী ও চাঁদের কক্ষতল একে অন্যের সঙ্গে 5° কোণ করে। সেইজন্য প্রতি অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় তারা একই সরল রেখায় আসতে পারে না। যে পূর্ণিমায় সরল রেখায় বা তার কাছাকাছি আসে সেদিন চন্দ্রগ্রহণ এবং যে অমাবস্যায় তারা আবার সরল রেখা বা তার কাছাকাছি আসে সেদিন সূর্যগ্রহণ হয়।

শুধু যে পৃথিবীরই উপগ্রহ চাঁদ আছে তাই নয়, অন্যান্য গ্রহেরও আছে। বৃহস্পতির উপগ্রহের গ্রহণ লক্ষ করে ডেনমার্কের বিজ্ঞানী ওলাফ রোমার 1775 খ্রীস্টাব্দে আলোরও যে গতি আছে ও তার গতিবেগ সব প্রথম বার করেছিলেন।

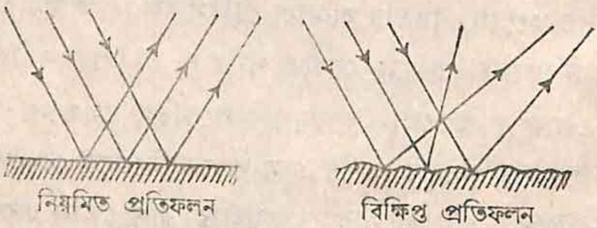
আলোর প্রতিফলন

ক্যারম খেলার সময় বোর্ডের দেওয়ালে যদি কোন ঘুঁটি আঘাত করে তখন দেওয়াল থেকে সেটা ছিটকে আসে। লক্ষ করলে দেখবে ঘুঁটি যে কোণ করে দেওয়ালকে আঘাত করল সেই কোণ করেই অন্য পাশ দিয়ে বেরিয়ে এল। ঘরের দেওয়ালের দিকে যদি একটা টেনিস বল ছুঁড়ে দাও দেখবে সেটাও একই ভাবে বেরিয়ে আসছে। একে বলে **প্রতিফলন** বা রিফ্লেকশন। প্রথম ঘটনায় ঘুঁটি প্রতিফলিত হয়েছে, দ্বিতীয় ঘটনায় টেনিস বল। আয়নার সামনে দাঁড়ালে নিজেদের চেহারা দেখতে পাবে। তোমার শরীর থেকে যে আলোর রশ্মিগুলো আয়নায় পড়েছিল সেগুলো সেখানে প্রতিফলিত হয়ে তোমার চোখে এসে পড়লে নিজেকে দেখতে পাও। এও প্রতিফলন, তবে আলোর। আলোর রশ্মি কোন একটি তলে প্রতিফলিত হয়ে দিক পরিবর্তন করলে তাকে আলোর প্রতিফলন বলে। তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত রোদের দিনে আয়নার সাহায্যে সূর্যের কিরণ প্রতিফলিত করে ঘরের মধ্যে ফেলেছ।

যে বস্তু আলো প্রতিফলন করে তাকে বলে প্রতিফলক। যে কোন তল থেকেই আলোর রশ্মি প্রতিফলিত হতে পারে, তবে একটি নির্দিষ্ট দিকে প্রতিফলনের জন্য প্রতিফলকের উপরের তল মসৃণ হওয়া দরকার। লক্ষ করলে দেখবে আয়নার উপরের তল খুব মসৃণ। যে সব ধাতুর পাতের উপর তল মসৃণ সেগুলি অনেকটা আয়নার কাজ করে।

আলোর রশ্মিগুচ্ছ কোন একটি নির্দিষ্ট দিক থেকে এসে প্রতি-ফলনের পর যদি আর একটি নির্দিষ্ট দিকে যায় তবে সেই প্রতিফলনকে **নিয়মিত প্রতিফলন** বলে। সূর্যের কিরণ আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে ঘরের দেওয়ালে যেখানে এসে পড়েছিল সেখানে আলোর পটি সৃষ্টি করেছিল। এটি নিয়মিত প্রতিফলনের উদাহরণ। আয়নার বদলে যদি কোন অমসৃণ তলের বস্তু সেখানে রাখো তবে দেখবে আলোর পটি আর দেখা যাচ্ছে না। বস্তুর তল অমসৃণ হওয়ায় আলোর রশ্মি প্রতিফলনের পর কোন একটি নির্দিষ্ট দিকে না গিয়ে বিভিন্ন দিকে যায়। যে প্রতিফলনে সমান্তরাল অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট দিক থেকে আসা রশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলনের পর কোন নির্দিষ্ট দিকে না গিয়ে বিভিন্ন রশ্মি বিভিন্ন দিকে যায় তাকে **বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন** বলে (চিত্র 6.13)।

কোন প্রতিফলকের উপর আলো এসে পড়লে আলোর একটি অংশ প্রতিফলিত ও অন্য অংশ শোষিত হয়। কাচের মত স্বচ্ছ

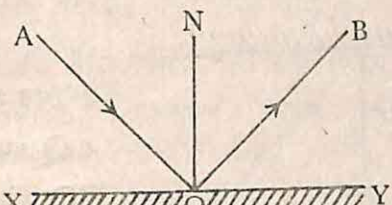


চিত্র 6. 13

বস্তুর উপর আলো পড়লে উপরের তলে খুব অল্প অংশই প্রতিফলিত হয় এবং বেশির ভাগ আলো কাচ ভেদ করে চলে যায়। প্রতিফলন

বাড়াবার জন্য কাচের নিচে পারদ মিশ্রিত অন্য ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হয়। একে বলে **সিলভারিং** করা। কালো বস্তু আলো শোষণ করে বেশি ও প্রতিফলন করে কম। সাদা বস্তুর বেলায় ঠিক উলটো। সাদা বস্তুর শোষণ ক্ষমতা কম, প্রতিফলন ক্ষমতা বেশি। সূচীছিদ্র ক্যামেরার ভিতর কালো রং কেন করা হয় এবার বুঝতে পারছ। আলো সংক্রান্ত অন্যান্য যন্ত্রের ভিতর দিকও কালো রং করা হয়। সাদা বস্তু ভাল প্রতিফলক হওয়ায় সিনেমায় সাদা রঙের পর্দা করা হয়। গ্রামাঞ্চলে অনেক লোক সাদা রঙের ছাতা ব্যবহার করেন। এও আলোর প্রতিফলনের জন্য।

সমতল কাচের তৈরি দর্পণকে সমতল দর্পণ বলে। মনে কর XY একটি দর্পণ (চিত্র 6.14)। দর্পণের যে অংশে প্রতিফলন হয় না সেই অংশে কাটা কাটা দাগ এঁকে ছবিতে দর্পণ দেখানো



চিত্র 6.14

হয়। কাটা দাগের বিপরীত দিকে প্রতিফলন তল। মনে কর AO আলোকরেখা দর্পণের উপর O বিন্দুতে এসে পড়েছে AO পথে। আলোর গতিপথ তীরচিহ্ন এঁকে প্রকাশ করা হয়। AO রেখা প্রতিফলনের পর তীরচিহ্নিত OB পথে গিয়েছে। O বিন্দুতে XY এর উপর ON লম্ব টান। AO রেখাকে **আপতিত রশ্মি,** OBকে **প্রতিফলন রশ্মি** এবং O বিন্দুকে **আপতন বিন্দু** বলে। ONকে দর্পণের উপর আপতন বিন্দুতে অঙ্কিত **অভিলম্ব** বলা হয়। অভিলম্ব ও আপতিত রশ্মির মধ্যের কোণকে আপতন কোণ এবং অভিলম্ব ও প্রতিফলিত রশ্মির মধ্যের কোণকে

প্রতিফলন কোণ বলে। ছবিতে AON কোণ আপতন কোণ এবং BON কোণ প্রতিফলন কোণ।

প্রতিফলন সূত্র

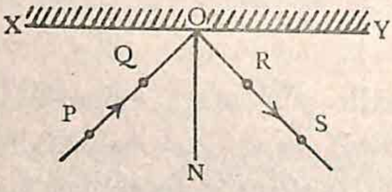
আলোর প্রতিফলনের সূত্র ছুটি :

(ক) আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণ পরস্পর সমান।

(খ) আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি ও আপতন বিন্দুতে অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে অবস্থিত।

প্রতিফলন সূত্রের প্রমাণ

এক টুকরো কাগজ নাও ও তার মাঝখানে XY রেখা টান। কাগজটিকে টেবিল বা সমতল বোর্ডের উপর রেখে চারটি পিন দিয়ে আটকাও (চিত্র 6.15)। একটি সমতল দর্পণ খাড়াভাবে XY রেখার উপর এমনভাবে বসাও যেন দর্পণের প্রতিফলন তল XY রেখার সঙ্গে মিলিত হয়। দর্পণের সামনে ছুটো পিন P ও Q এমনভাবে বসাও যেন PQ রেখা দর্পণকে তির্যকভাবে ছেদ করে।



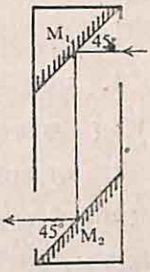
চিত্র 6.15

ডানদিকে চোখ রেখে আরো ছুটো পিন R ও S এমনভাবে বসাও যেন P,Q,R এবং S পিন চারটি একই সরলরেখায় থাকে। P,Q,R এবং S পিন চারটির অবস্থান ছোট বৃত্ত এঁকে চিহ্নিত কর। P এবং Q বিন্দু যোগ করে PQ রেখা এবং R এবং S বিন্দু যোগ করে RS রেখা টান। PQ, RS রেখা ছুটি XY-এর উপর O বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। O বিন্দুতে XY রেখার উপর লম্ব ON টান। PQ আপতিত রশ্মি,RS প্রতিফলিত রশ্মি ও অভিলম্ব ON একই তলে অবস্থিত। চাঁদা দিয়ে কোণ মাপলে দেখবে আপতন কোণ PON প্রতিফলন কোণ RONএর সঙ্গে সমান। এই পরীক্ষা থেকে প্রতিফলনের সূত্র ছুটি প্রমাণিত হল।

পেরিস্কোপ

আলোর প্রতিফলন কাজে লাগিয়ে এক ধরনের যন্ত্র তৈরি করা হয়, তার নাম পেরিস্কোপ। কোন দূরের বস্তু সোজাসুজি দেখার অসুবিধে থাকলে পেরিস্কোপের সাহায্যে দেখা সম্ভব।

M_1 ও M_2 দুটি সরল দর্পণ পেরিস্কোপের নলের অক্ষের সঙ্গে 45° কোণ করে লাগান আছে (চিত্র 6.16)। মনে কর জলের নিচে সাবমেরিনে বা ডুবো-জাহাজে বসে তুমি জলের উপরে ভাসমান কোন জাহাজ দেখতে চাইছ। জাহাজ থেকে আসা অনুভূমিক আলোকরশ্মি M_1 দর্পণে প্রতিফলিত হল। M_1 দর্পণ অক্ষের সঙ্গে 45° কোণ করে থাকায় আপতিত রশ্মির আপতন কোণ 45° হবে। সুতরাং প্রতিফলিত কোণও 45° হওয়ায় প্রতিফলিত রশ্মি খাড়াভাবে নিচে এসে M_2 দর্পণে পড়বে। একই ভাবে আলোকরশ্মি M_2 দর্পণে প্রতিফলিত হবে ও অনুভূমিকভাবে বেরিয়ে যাবে। নলে চোখ রাখলে জাহাজ দেখা যাবে।



চিত্র 6.16

পেরিস্কোপের ব্যবহার সাবমেরিনে, যুদ্ধক্ষেত্রে হয়ে থাকে। গড়ের মাঠে বাইরে থেকে খেলা দেখার সময় অনেকে পেরিস্কোপ ব্যবহার করে।

দৃশ্য ও অদৃশ্য রশ্মি

এতক্ষণ তোমরা আলোর কথা পড়লে। আলোর সাহায্যে আমরা দেখতে পাই। তাই আলোকে বলে দৃশ্য রশ্মি। এ ছাড়া আরো অনেক রকম রশ্মি এইসব নক্ষত্র থেকে পৃথিবীতে আসছে যাদের মাধ্যমে আমরা ঐসব নক্ষত্রের পরিচয় পাই। এইসব রশ্মি আমরা দেখতে পাই না। তাই এদের বলে অদৃশ্য রশ্মি। সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্র থেকে এক্স রশ্মি, অতি বেগুনি রশ্মি, রেডিও তরঙ্গ, মহা-

জাগতিক রশ্মি, অবলোহিত রশ্মি প্রভৃতি আমরা পাই। এরা সকলেই অদৃশ্য রশ্মি। এক্স রশ্মি ও অতিবেগুনি রশ্মি আমাদের চোখের পক্ষে ক্ষতিকর। সেজন্য সূর্যের দিকে খালি চোখে তাকান উচিত নয়।

প্রশ্ন

1. নক্ষত্র কাকে বলে? রাশি বলতে কি বোঝ? মোট কয়টি রাশি আছে? ধ্রুবতারা আকাশে স্থির দেখায় কেন? মহাকাশের আয়তন কত?

2. আলোকবর্ষ কাকে বলে? পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্র চার আলোকবর্ষ দূরে। সেখান থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে কতদিন লাগবে?

3. চাঁদের কলা বলতে কি বোঝ? চিত্রের সাহায্যে চাঁদের কলা ব্যাখ্যা কর।

4. কোপারনিকাস, গ্যালিলিও ও কেপলার কিজন্য বিখ্যাত? তাঁদের জীবনী লেখ।

5. আলো সরল রেখায় চলে—পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ কর। সূচীছিদ্র ক্যামেরার গঠন ও কার্যপ্রণালী বর্ণনা কব।

6. ছায়া কিভাবে সৃষ্টি হয়? প্রছায়া ও উপচ্ছায়া বলতে কি বোঝ? বিন্দু উৎস ও বিস্তৃত বস্তু এবং বস্তুর চেয়ে বড় উৎসের ক্ষেত্রে ছায়া কেমন দেখাবে ছবি দিয়ে বোঝাও।

7. গ্রহণ কাকে বলে? চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ ছবির সাহায্যে বর্ণনা কর।

8. গ্রহণ কাকে বলে? আলোর প্রতিফলনের সূত্র লেখ। পেরিস্কোপের গঠন প্রণালী বর্ণনা কর। পেরিস্কোপ কি কাজে লাগে?

9. শূন্য স্থান পূর্ণ কর:

   (ক) আমাদের মাথার একেবারে সোজা উপরে খ-গোলকের বিন্দুকে বলে —।

   (খ) আমাদের পায়ের একেবারে সোজা নিচে খ-গোলকের বিন্দুকে বলে —।

10. ভুল সংশোধন কর:

   (ক) নক্ষত্রের নিজস্ব আলো নেই, পৃথিবীর আলো প্রতিফলিত করে।

(খ) গ্রহদের নিজস্ব আলো আছে।

(গ) আলোকবর্ষ গ্রহদের আলো মাপার একক।

11. গ্রহ ও নক্ষত্রে পার্থক্য কি? কোন নক্ষত্রে মহাকাশযান নামলে কি হবে?

12. রাশিচক্র কাকে বলে? রাশিচক্রে কয়টি রাশি আছে? এদের সাহায্যে কি বোঝান হয়ে থাকে? ধ্রুবতারাকে উত্তরের নক্ষত্র বলা হয় কেন?

13. শূন্য স্থান পূর্ণ কর:

(ক) আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে — কিলোমিটার।

(খ) এক আলোকবর্ষ — কিলোমিটার দূরত্বের সমান।

(গ) কোপারনিকাসের জন্ম — সালে, মৃত্যু — সালে।

(ঘ) কেপলারের জন্ম — সালে, মৃত্যু — সালে।

(ঙ) গালিলিওর জন্ম — সালে, মৃত্যু — সালে।

(চ) সাধারণত আলো — চলে।

14. চাঁদের কলা বলতে কি বোঝায়? পূর্ণিমা, অমাবস্যা প্রভৃতি কি ভাবে ঘটে ছবি এঁকে দেখাও। প্রতি পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় গ্রহণ দেখা যায় না কেন?

15. আলো সরল রেখায় চলে প্রমাণ কর। অন্য কোন উদাহরণ কি তোমার জানা আছে যা দিয়ে প্রমাণ করা যায় আলো সরল রেখায় চলে?

16. ছায়া, প্রচ্ছায়া প্রভৃতি বলতে কি বোঝায়? ছবি এঁকে দেখাও। চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ কেন হয়?

17. নিয়মিত প্রতিফলন ও বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন কাকে বলে? প্রতিফলন সূত্রগুলি লেখ। পেরিস্কোপের কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

———

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস

Padarthavidya O Rasayan 1

Rs 3·65

SBN 19 560870 4

প্রচ্ছদ, ব্লক ও মুদ্রণ—রিপ্রোডাক্‌সন সিণ্ডিকেট, কলিকাতা ৬